সেলাই

আনিসুল হক

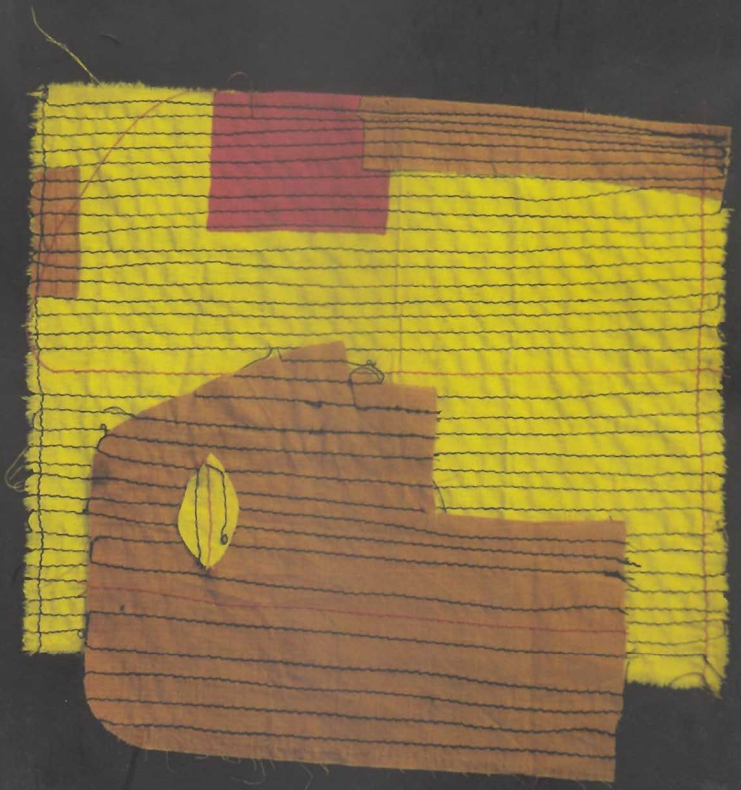

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

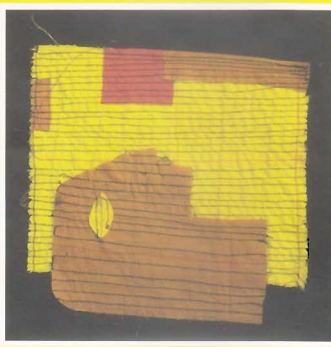

তারস্বরে কাক ডাকে। সন্তানসম্ভবা বিজলির মন কেমন করে। তার স্বামী কাজে গেছে কারখানায়। সাভারের রানা প্লাজা নামের একটা ভবনে বিজলির স্বামী নজিবর কাজ করে। তার কিছু হলো না তো। বিল্ডিংটার নাকি পিলার ভাঙা। দুটো বাচ্চাকে ঘরে রেখে কাজে যায় হাসনা। এমনি করে কতজন কাজে যায়। কেউ ফেরে কেউ ফেরে না। স্বামীর লাশ ভেবে কবরস্থ করা হয়েছে একটা মৃতদেহ, তারপর একদিন জীবন্ত স্বামী ফিরে আসে কাকলি বেগমের। এখন কী করবে তারা। মৃত স্বামীর নাম করে কিছু ক্ষতিপূরণ পাওয়া গেছে, আরও কিছু টাকা আসবে বলে আশা আছে। কাকলি বেগমের পরিবার ফিরে আসা আবদুস সালামকে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারে না।

বিজলির কোল জুড়ে আসে সন্তান। কেউ তার খোঁজ নেয়নি। সাংবাদিকেরা নয়, সরকারি লোকজন নয়। পোয়াতি বিজলি নিজের শরীর নিয়েই চলতে পারে না, স্বামীর খোঁজই বা করে কী করে, ক্ষতিপূরণই বা আদায় করে কী করে। তবুও জন্মের চিৎকার ঘোষণা করে নতুন বার্তা। পোয়াতির কাটা-পেটে পড়ে সেলাই।

আনিসুল হক তাঁর মমতামাখা কলমে তুলে ধরলেন এক ভয়াবহ মানবিক ট্রাজেডির পেছনের মানুষগুলোর অন্তরঙ্গ হাসি-কান্নার বিবরণী, যেন অশ্রুর সুতোয় গাঁথা এ এক জীবনের নকশিকাঁথা।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ
প্রচ্ছদের আলোকচিত্র : রিচার্ড রোজারিও
সূচিকর্ম : নুরুন নাহার চৌধুরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

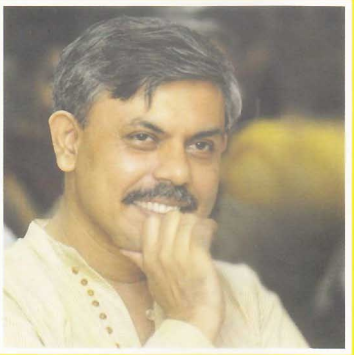

আনিসুল হকের জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, রংপুরের নীলফামারীতে। পিতা মরহুম মো: মোফাজ্জল হক, মাতা মোসাম্মৎ আনোয়ারা বেগম। জন্মের পরেই পিতার কর্মসূত্রে তারা চলে আসেন রংপুরে। রংপুর পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ আর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন তিনি। ছাত্রাবস্থা থেকেই সাহিত্য ও সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে প্রকৌশলী হিসেবে একবার যোগ দিয়েছিলেন সরকারি চাকরিতে, কিন্তু ১৫ দিনের মাথায় আবার ফিরে আসেন সাংবাদিকতা তথা লেখালেখিতেই। বর্তমানে একটি প্রথম শ্রেণীর জাতীয় দৈনিকে সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

সাহিত্যের প্রায় সব শাখাতেই কমবেশি তাঁর বিচরণ। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, কলাম, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য, ভ্রমণকাহিনী, কাব্য-উপন্যাস, শিশুতোষ রচনা—নানা কিছু লিখেছেন। গদ্যকার্টুন নামে লেখা তাঁর কলাম খুবই পাঠকপ্রিয়।

মা ইংরেজিতে 'ফ্রিডম'স মাদার' নামে অনূদিত ও দিল্লি থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ব্যাপক প্রশংসা লাভ করেছে। উড়িষ্যা থেকেও ওড়িশি ভাষায় বেরিয়েছে *মা*-এর অনুবাদ।

সাহিত্যের জন্যে পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কার, সিটি ব্যাংক আনন্দআলো পুরস্কার, খালেকদাদ চৌধুরী পদক, খুলনা রাইটার্স ক্লাব পদক, কবি মোজাম্মেল হক ফাউণ্ডেশন পুরস্কার, সুকান্ত পদক, ইউরো শিশুসাহিত্য পুরস্কার। তাঁর উপন্যাস *মা* পাঠ করে সরদার ফজলুল করিম তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন : 'আমি বলি দুই মা। ম্যাক্সিম গোর্কির মা আর আনিসুল হকের মা। . . . এখন দুই মা যথার্থ মা হয়ে উঠেছেন আমার কাছে।'

নিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

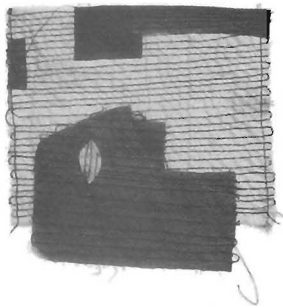

সেলাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় প্রকাশন প্রকাশিত এই লেখকের বই–

উপন্যাস

ফাঁদ
ভালোবাসা, আমি তোমার জন্যে কাঁদছি
চিয়ারি বা বুদু ওরাঁও কেন দেশত্যাগ করেছিল
বীর প্রতীকের খোঁজে
হৃদিতা
মা
ক্ষুধা এবং ভালোবাসার গল্প
স্বপ্নের মানুষ
দুঃস্বপ্নের যাত্রী
আলো-অন্ধকারে যাই
ফিরে এসো, সুন্দরীতমা
এতদিন কোথায় ছিলেন
তোর জন্যে, প্রিয়তা
জননী সাহসিনী ১৯৭১
না-মানুষি জমিন
গুম হওয়ার পরে
সেলাই

রম্যরচনা

আবার তোরা কিন্টে হ

প্রবন্ধ

লেখা নিয়ে লেখা

কাব্যগ্রন্থ

তোমাকে ভাবনা করি

সংকলন

শ্রেষ্ঠ উপন্যাস
প্রথম চার উপন্যাস
প্রেমের চার উপন্যাস
প্রিয় চার উপন্যাস
ভালোবাসার চার উপন্যাস
হাসির চার উপন্যাস
চার রকম ভালোবাসা
চার অপরাজিতা
চার প্রিয়তা
চার অনন্যা
শুধু তোমার জন্যে
সেরা ১০ উপন্যাস
ভালোবাসা চতুষ্টয়

শিশু-কিশোর

শিপরা নামের পিঁপড়া মেয়ে

অনুবাদ

The Trap

আনিসুল হক-কে নিয়ে

অন্তরঙ্গ আনিসুল হক
সাক্ষাৎকার ও গ্রন্থনা : মাসউদ আহমাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলাই

আনিসুল হক

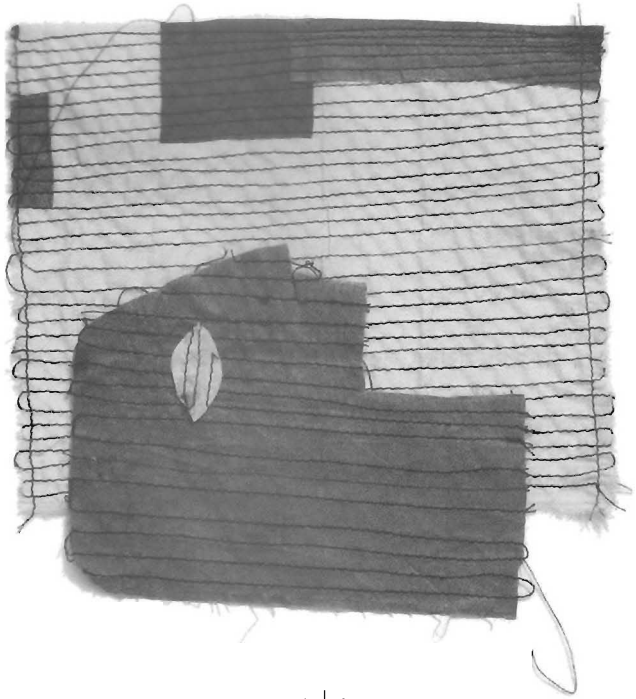

সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলাই
আনিসুল হক
© পদ্য পারমিতা

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪

সময়

সময় ৯৫২

প্রকাশক
ফরিদ আহমেদ
সময় প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

গ্রাফিকস্
সময় গ্রাফিকস্
২৬১/২ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মুদ্রণ
সময় প্রিন্টার্স
২২৬/১ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা

মূল্য: ১৫০.০০ টাকা মাত্র

SELAI (Stitch) a novel by Anisul Hoque. First Published: February Book Fair 2014, by Farid Ahmed, Somoy Prakashan, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka 1100.

Web: www.somoy.com E-mail: info@somoy.com
Writer's E-mail: anisulhoquem@yahoo.com

Price: Tk. 150.00 only

ISBN 978-984-90870-0-7 Code: 041

নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র 'সময় . . .', প্লাজা এ. আর, (৪র্থ তলা), সড়ক ১৪ (নতুন) ধানমন্ডি (মিরপুর রোড, সোবহানবাগ মসজিদের পাশে), ঢাকা। ফোন : ৯১১৬৮৮৫

অন লাইনে পাওয়া যাবে : www.rokomari.com, www.boi-mela.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

লেখক সাংবাদিক মোমিন রহমান। অন্যদিন পত্রিকার ঈদসংখ্যার জন্য এই উপাখ্যানটি লেখার ধারণা তিনিই আমাকে প্রথম দিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো কথা

প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত কতগুলো খবর এই আখ্যানে ব্যবহার করা হয়েছে। সূত্র যথাস্থানে উল্লেখ করা হলো। যাদের লেখা সংবাদ/ ফিচার ব্যবহার করা হলো, তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই। রানা প্লাজা ধ্বংসের করুণ মর্মদন্ত ট্রাজেডি নিয়ে উপাখ্যান লেখার পরামর্শ আমাকে দিয়েছিলেন অন্যদিন পত্রিকার মোমিন রহমান। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আনিসুল হক
ধানমণ্ডি, ঢাকা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারস্বরে কাক ডাকে। ছাপড়া ঘরে সস্তা চকির বিছানায় বসে বিজলি জোরে জোরে শ্বাস ছাড়ে, আর আপন মনে বিড়বিড় করে, এই সুমে কাক ডাকে ক্যানে?

ঘরটা ছোট, নিচু, ওপরে টিন, চারপাশে পাঁচ ইঞ্চি দেয়াল; এটাই তাদের রান্নাঘর, এটাই তাদের শোবার, ঘরের অর্ধেকটা জুড়েই এই ছোট্ট চকি, অপর পাশে কেরোসিনের চুলা, হাঁড়িকুড়ি, জামাকাপড় টাঙানোর একটা দড়ি ঝুলছে দেয়াল ঘেঁষে, মশারির দুই প্রান্ত মাথার দিকে আটকানোই থাকে, এই ঘরের এক দিকে একটা ছোট্ট জানালাও আছে। সেই জানালা দিয়ে বৈশাখী সকালের ঝলমলে আলোও আসছে ঘরের ভেতরের অন্ধকারের সঙ্গে একটা মল্লযুদ্ধ চালাতে। সে আলোয় দেখা যায় দেয়ালে সাঁটা সিনেমার পোস্টারে সাকিব খান ও অপু, এক পাশে একটা আয়না ঝুলছে, তার নিচেই একটা পেরেকে গাঁথা ঝুড়িতে চিরুনি, ফিতা, ফেয়ার এন্ড লাভলি। ঘরের পাশের গলিতে বস্তির ছেলেমেয়েরা হৈচৈ করছে, সেই হল্লা ভেদ করে আসছে কাকের তীব্র কা-কা ডাক। বিজলির বুকটা কেঁপে ওঠে। এমনিতেই তার শরীর ভালো নয়, পেটটা একেবারে ধামা হয়ে আছে, রোগা পা দুটোর ওপরে এই আট-মাসের গর্ভের ভার নিয়ে সে ঠিকমতো হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না; তাকে শ্বাস নিতে হয় জোর করে। তার কষ্ট হয়। তার উপরে যদিল এইভাবে কাউয়ায় ডাক পাড়ে, বুকটা ধরাস করি উঠে কিনা কন।

বিজলির মন চলে যায় তাদের গ্রাম মিঠাপুকুরের কাটাখালি নদীর বাঁধের ওপরে, যেখানে দাঁড়িয়ে সে দূরের মরে যাওয়া নদীর জলে চরে বেড়ানো হাঁসের পালের দিকে তাকিয়ে থাকত, আর পেছনে তার মা চিৎকার করত, ও বিজলি, হিরু কোনটে, হিরুক তো মুই খুঁজি পাঁও না, আবার পুকুরত ডুবিয়া না মরে, যা তো... মোর জানি কেমন কেমন নাগে, যা তো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখ তো ফির ঘরের চালত কাউয়া ডাকিবার নাগছে... কী খালি বান্দের ওপরে খাড়ায়া থাকে... হিরুর বয়স তখন হয়তো চার, সে কেবল হাঁটতে শিখেছে, বিজলির আট, সে এখনও দায়িত্ব নিতে শেখেনি, কিন্তু মা তার চায় সে দেখে রাখুক ছোট ভাই হিরুকে, যার কোমরে ঘুঙুর বাঁধা। হিরুর বয়স এখন ১৪/১৫, সে এখন মিঠাপুকুর হাই স্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে; বিজলি তাকে মাঝে-মধ্যে টাকা পাঠায় বিকাশ করে, সেই হিরুর কিছু হয় নাই তো? হিরু দুই মাইল পথ হেঁটে স্কুলে যায়, আবার ফেরে, কখন কী হয়ে যায়, বলা যায়! মার শরীরটাও বেশি ভালো না, বাবা মারা যাওয়ার পরে মা একা হয়ে গেছে, আর সংসারের পুরাটা বোঝা তো তাকে একাই বইতে হয়!

কা কা। কাকটা কি ঠিক তাদের ভাড়া ঘরের টিনের চালের ওপরেই বসেছে?

পাশের ঘরে থাকে হাসনাবুবু। তার দুই ছেলে শান্ত (৪) ও শাহিন (২), তাদেরকে দেখে হাসনাবুবুর ভাগ্নি নাসরিন (১১)। হাসনাবুবু ফ্যাকটরিতে যাওয়ার আগে আজও বলে গেছেন, তিনটা কাচুয়া ছাওয়া থুয়া কামে যাইতোছোম বিজলি, ওগলাক একনা দেখি থুস। ওদেরকে কেমন করে দেখবে বিজলি, তার তো নড়াচড়ার ক্ষমতা নাই। শরীর চলে না, শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। কাক আবার ডাকে, তখন এই বাচ্চাগুলোর কুশল নিয়ে বিজলি উদ্বিগ্ন হয়। সে গলার রগ ফুলিয়ে চিৎকার করে বলে, নাসরিন, অ নাসরিন, কোনটে গেইলেন বাহে, তোমরাগুলান ভাল আছো তো!

কথা কটা বলতেই হাঁপসে যায় বিজলি। পেটটা ধরে খানিকক্ষণ জিরোয়।

কাকটা আবার ডাকে নাকি। বিজলি কান খাড়া করে। ওই ঘরে হাসনাবুবুর ছেলে দুটো কি কাঁদছে? বাচ্চার কান্না তার কানে আসে।

বিজলির স্বামী নজিবর সকাল সকাল ফ্যাক্টরিতে চলে গেছে। লোকটার চায়ের বদঅভ্যাস হয়েছে, বিজলিকেও ধরিয়ে দিয়েছে চায়ের নেশা! ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সে নিজেই চা বানায় কেরোসিনের চুলায়। কনডেন্সড মিল্কের চা। পাতিলে পানি ফুটছে, চা পাতা ঢাললে গন্ধ ছোটে, সেই গন্ধ এসে লাগে বিজলির নাকে। তার ঘুম ভেঙে যায়, একটা আরাম বোধ হয়, তার স্বামী তার জন্যও চা বানাচ্ছে, এই ছোট্ট ঘটনা তাকে একটা আশ্বাসের বার্তা যেন দেয়, মনে হয়, নজিবর তাকে ভালোবাসে। তার স্বামীভাগ্য ভালো। তবুও মুখে বিজলি বলে অন্য কথা, তুমি ক্যানে চা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানাবার নাগছেন, মুই করি দিতেছম, তোমরা রেডি হয়া চা খায়া যান কামত যান।

বিজলি অতি কষ্টে বিছানায় শোয়া থেকে উঠে বসে।

ততক্ষণে নজিবরের চা বানানো শেষ। তাদের একটা মাত্র চায়ের কাপ, তাও ডাটাভাঙা। নজিবর সেটাতে চা ঢেলে বিজলির কাছে নিয়ে আসে, খাও।

বিজলি বলে, তুমি আগে খাও। তোমাক না কামে যাওয়া নাগবে। মুই খাইম অ্যালা।

না-না, তাড়াহুড়া নাই তো। মোবাইল ফোনে সময় দেখে নিয়ে নজিবর বলে।

সে বিজলির পাশে বসে চায়ের পেয়ালা হাতে। বিজলি হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নেয়। ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে। চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছে, চা-পাতার গন্ধ তার শরীরটা চাঙা করছে, পাশে বসে থাকা স্বামীর নীরব মমতা সে উপভোগ করছে। চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে সে বলে, এলা তোমরা খান। মুই ফির খাইম এলা।

নজিবরও বউয়ের হাত থেকে কাপ নিয়ে একটা চুমুক দেয়। তারপর আবার কাপ দেয় বউয়ের হাতে। দুই কাপ চা তারা এইভাবে দুজনে মিলে মিলে এক সঙ্গেই শেষ করে। তাদের দুইটা জীবন, পেটের মধ্যে আরেকটা বাড়ছে, তারা এই ছোট্ট পরিসরে ভালোবাসায়, পরিশ্রমে, ত্যাগে, কষ্টে আনন্দেই ভাগাভাগি করে নিতে পারছে, কাপের চায়ের স্বাদ আর গন্ধ আর মিষ্টতা যেন সেই আশ্বাসটাই দিয়ে চলেছে।

বিজলি কদিন হলো কাজে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। পেট নিয়ে নড়তে পারে না। কাজে যাবে কী করে। তার ওপর ফ্যাক্টরিতে গিয়েও সে অসুস্থ বোধ করে। হাত চলে না। সুপারভাইজার নিজেই তাই তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন।

চা শেষ হলে জগের পানি দিয়ে একটা গামলার ওপরে ধরে কাপটা ধোয় নজিবর। এরই মধ্যে সে প্যান্ট পরে নিয়েছে। বিজলির গালে দুটো চুমু দিয়ে সে বিদায় নেয়।

বিজলি গত দুইটা দিন ভালোই ছিল। নজিবর কাজে যায় নাই। তিন দিন আগে সকাল সকাল চলে এসেছে কাজ থেকে।

এত তাড়াতাড়ি চলিয়া আসলেন যে? বিজলি স্বামীকে জিগ্যেস করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যাক্টরি বন্ধ।

কও কী? গণ্ডগোল হইছে নাকি কোনো?

না। গণ্ডগোল হয় নাই। বিল্ডিঙে ফাটা বাইর হইছে। সবাই ভয় পায়া বাইর হয়া আসছিল। তারপর গেটে তালা দিয়া দিছে। কইছে বলে তোমরা খোঁজ নিবা। আজকা আমরা ফাটল পরীক্ষা করমো। যদিল খারাপ কিছু হয়, তাইলে ফ্যাক্টরি চলবার নয়। যদিল খারাপ কিছু না হয়, কাইলকা সকাল থাকি ফির ফ্যাক্টরি চালু।

কালকা সকালবেলা ফির যাইবেন?

হ যামো তো। ফ্যাক্টরি বন্ধ থাকিলে তো ক্ষতি। বেতন পামো কোনটে। এখন তো তোমারও চাকরি নাই। তার মাঝত ফির তোমরা পোয়াতি। বাচ্চা হওয়ার সুম যদিল ফির ট্যাকাপাইসা লাগে, তখন?

স্বামী দিনের বাকিটা সময় ঘরে থাকে। রান্নাবান্নার কাজে সাহায্য করে বিজলিকে। বলে, তোমাক আর আইজকা চুলার কাছত যাওয়া না নাগিবে, মুই আইজকা খিচুরি আন্দি দেই বাহে।

না। না। মুই পারিম। পোয়াতি শরীরত একেরে চুপচাপ বসি থাকা ঠিক না। একনা একনা কাম করা খায়।

আরে তোমার গরম লাগিবে।

মোর গরম সহ্য করা অভ্যাস আছে।

আরে তোমার না হয় গরম সহ্য করা অভ্যাস আছে, তোমার প্যাটের ভিতরে মোর ছাওয়া খান আছে না, তার তো অভ্যাস নাই। তাকে তোমরা গরম না খিলান বাহে।

বিজলিকে সে কিছুতেই চুলার কাছে যেতে দেবে না।

পাশের ঘর থেকে হাসনাবু আসে। এ বিজলি মোক একনা নুন কর্জ দিবার পারিবু?

হাসনাবু কথা কটা বলে দেখে চাল-ডাল ধুয়ে খিচুড়ি চুলায় তুলছে নজিবর, সে খানিকটা বিব্রত হয়, নজিবর, মোরও তো আইজকা কাম নাই, মোক কইলেই তো মুই তোমাক পাক করি দেও, সরেন তো তোমরা, মুই পাক করি দিতোছোম।

নজিবর বলে, ক্যানে, দাউদ ভাই আসে নাই, তাকে তোমরা আন্দি দেন না কেনে, মোক আন্দি খাওয়ান না লাগিবে। নুন কর্জ করিবার আসছেন, এই ধরেন নুন, এলা যান ক্যানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাবু একটা হলুদ শাড়ি পরেছে, তাকে সুন্দর লাগছে, সবুজ শাড়িতে উঁচু পেট ঢেকে রাখা বিজলি ভাবে। হাসনাবুর আবার ঢং কত, সে তাদের রান্না রেঁধে দিতে চায়, পোয়াতি শরীর নিয়ে স্বামীর কোনো কাজে লাগতে না পারা বিজলি খানিকটা ঈর্ষান্বিত হয়। হাসনাবু আর নজিবর একই বিল্ডিংয়ের কারখানায় কাজ করে, সকালে প্রায় এক সাথেই বের হয়, দুইজনে কি গল্প করতে করতে যায়? দুইজনে কি একসঙ্গে টিফিন করে? মুই এগলা কী ভাবিবার লাগিছোম? বিজলি ভাবে।

চুলায় খিচুড়ি তুলে দিয়ে নজিবর এসে বসে বিজলির পাশে। বিজলি মেয়েটা লম্বা, শুকনা, ফরসা এবং তার দাঁত উঁচু। এই পাড়ায় এবং কারখানায় সে সুন্দরি বলে গণ্য।

নজিবরের গায়ে টিশার্ট, নীল-কালো, অন্ধকার, পরনে জিনসের প্যান্ট, রংচটা। বিজলি অনেকবার বলেছে, এই রং উঠি যাওয়া প্যান্টটা বদলাও না ক্যানে? নজিবর শুনে হাসে। বলে, তুমি গারমেন্টে কাম করিয়া যদিল কও বলে রংচটা জিনসের প্যান্ট বদলান লাগিবে, তাইলে গেরামের মানুষজন কী কইবে? তুমি দেখো না, হামরা কত কষ্ট করিয়া প্যান্টের রং তুলি। এগলাই এখন চলে।

নজিবর বিজলির হাত নিজের হাতে তুলে নেয়। আঙুল নিয়ে খেলে। বলে, শোনো, মুই কিন্তু মাইয়া চাও। মোর বেটাছাওয়া দরকার নাই।

বিজলি বলে, আল্লাহ যা দিবে, তাকে নেমো।

যদিল বেটাছাওয়া হয়, মুই নাম রাখিম শাকিব। কেমন হইবে?

কেন শাকিব কেন?

শাকিব খানের পোস্টারটার দিকে আঙুল তুলে নজিবর বলে, তোমারও পছন্দ মোরও পছন্দ। আবার ক্রিকেট খেলে সাকিবও আছে। খারাপ কী?

না, খারাপ না। আর মাইয়া হইলে?

মাইয়া হইলে নাম রাখিম মৌসুমী।

ও তোমার তো আবার মৌসুমীরে পছন্দ। মুই লাইক করোম অপুরে।

সিনেমার দুই নায়িকার মধ্যে কে ভালো বেশি, এই নিয়ে দুজনে গল্প করে।

আজকে নজিবর কাজে গেছে। হরতালের মধ্যেও বোধহয় কারখানা খুলে দিয়েছে। একা একা বসে থাকে, শুয়ে থাকে বিজলি। কাজে গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাবুও।

নজিবর ফোন করেছিল মোবাইলে। বলেছে, 'আজকা আর আসা হইবে না। কারখানা চালু হয়া যাইবে। বিল্ডিঙের মালিকে কইছে বিল্ডিংয়ে কোনো অসুবিধা নাই। কারখানার ম্যানেজার সুপারভাইজার সবাই আছে। মুই কারখানাত কামোত ঢুকবার লাগছোম। তোমরা শুতি বসি থাকো। কোনো অসুবিধা হইলে ফোন করিয়েন।'

বিজলির বাচ্চাটা হয়ে গেলেও বহুদিন সে কাজে যেতে পারবে না। তারপর বাচ্চাটা যখন বুকের দুধের পাশাপাশি নরম ভাত খেতে শুরু করবে, তারপর হয়তো একটু একটু করে বাইরে বেরুতে পারবে বিজলি।

সাত-পাঁচ ভাবছে, এই সময় ছুটে আসে নাসরিন, হাসনাবুর ভাগ্নি, লাল একটা ওড়না পরেছে সবুজ জামার ওপরে, দুই চুলে বেণী। তার কোলে হাসনাবুর ছোট ছেলে শাহিন (২)। 'খালা খালা। শুনছেন নাকি, সাভারত নাকি ফ্যাক্টরি ভাঙি পড়ছে। সবায় দৌড়ায়া সাভারত যাইতোছে। কী হইবে এলা?'

শুনে বিজলি চমকে ওঠে। তার বুক কাঁপে। সে 'ও আল্লাহ গো ও খোদা গো' বলে বিড়বিড় করে। নজিবর তো বলেছিল, তাদের বিল্ডিঙে ফাটল দেখা দিয়েছে। বিল্ডিং কি তাহলে তাদেরটাই ভেঙেছে? যদি তা হয় তাহলে কী হবে? নজিবরের কারখানা ছয় তলায়। হায় আল্লাহ, এইটা কি শুনলাম? আল্লাহ এইটা যেন অন্য কোনো কারখানা হয়।

বিজলি ফোন করে স্বামীর নম্বরে।

ফোন বাজে। কিন্তু নজিবর ফোন ধরে না। ফোন বাজে, তাইলে নিশ্চয়ই নজিবর ভালো আছে। নিজেরে বাঁচাইতেছে, দৌড়ায়া বাইরে আসছে, হৈচৈ, এই কারণে ফোন ধরেনি। বিজলি আল্লাহকে ডাকে। আর একটা কাক তার টিনের চালে ডেকেই চলে, ডেকেই চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

হাসনার আজকে কাজে যেতে ইচ্ছাই করছিল না। ছোট বাচ্চাটার জ্বর। সে হাসনাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। মা, যাবা না। তার কচিমুখে দুধের গন্ধ, সে দু হাতে গলা ধরে লটকে থাকে। শাহিনও মাকে জড়িয়ে ধরে। বলে, মা, আজকা না গেলে হয় না?

গত দুইদিন কারখানায় ঠিকমতো কাজ না হওয়ায় ঘরে থেকেছে হাসনা। তাতেই ছেলে দুটো তার নেওটা বনে গেছে।

হাসনার পরনে সালোয়ার কামিজ। শ্যামলা রঙের গোল মুখের মেয়েটির দুই চোখে মায়া। তার ভাগ্নি নাসরিনও খালার গড়নই পেয়েছে। তার গায়ের রং আরেকটু চাপা। সে কারণেই সে দুবেলা ফেয়ার এন্ড লাভলি মাখে আর আয়নায় চেয়ে দেখে, কতটা ফরসা সে হতে পেরেছে। তার খালু, শান্ত ও শাহিনের বাবা, দাউদ মিয়া বলে, মাসরে, তুই তো এমনিতেই সুন্দর, গায়ের রং ফরসা হইলেই মানুষ সুন্দর হয় না, নাসরিন সেটাতে সান্ত্বনা পায়, তবে তাতে তার নিজের রং ফরসা করার প্রয়াস থেমে থাকে না।

দাউদ মিয়াও চাকরি করে গার্মেন্টসেই। তবে সে গার্মেন্টসের সেলাই শ্রমিক নয়। মাইক্রোবাসের ড্রাইভার। তার কারখানাটাও সাভারেই। গাড়ি নিয়ে সে ঢাকা-গাজিপুর নানা জায়গায় ছোটাছুটি করে।

সকাল ৭টায় বেরিয়ে পড়ে দাউদ। ফেরার কোনো ঠিক নাই। মাঝে-মধ্যে ১১টা ১২টাও বেজে যায়। আয়-রোজগার ভালোই করে। তেল চুরি করে কিছু টাকা আসে। পার্টস বিক্রি করে। গাড়ি সার্ভিসিং করতে দেওয়া হলেও কিছু টাকা সরানো যায়। আজও দাউদ সকাল সকাল বেরিয়ে গেছে।

হাসনা বেরয় একটু পরে। ছেলেরা ছাড়ে না। কিন্তু হাসনাকে বেরুতেই হয়। টিফিন বক্সে নেয় রুটি আর ভাজি। হাতে ছোট্ট একটা ব্যাগ। তাতে টিফিন বক্স, আর মোবাইল ফোন। নাসরিনকে বলে দেয়, বাচ্চা দুটোকে যেন ঠিকভাবে সে দেখে রাখে। বাইরে টাইরে না যায়। কোনো সমস্যা হলে যেন পাশের বিজলি খালাকে বলে। তার কাছে মোবাইল আছে।

হাসনা খালা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাসরিন বেড়ায় টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়ায়। নিজেকে দেখে। চিরুনি দিয়ে চুল আচড়ায়। বেণী পরিপাটি করে। এবং মুখে ফেয়ার এন্ড লাভলি ক্রিম মাখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্ত তার পেছনে এসে দাঁড়ায় এবং বলে, বুবু, আমিও মাখুম?

কী?

তুমি যেইটা মাখো।

এইটা মাইয়ামানষের ক্রিম। এইটা বেটাছাওয়ারা না মাখে বাপ।

মাখলে কী হয়?

কির্মি হয়।

মাইয়ামানষে মাখলে কির্মি হয় না?

না।

শাহিন তখনই কান্না জুড়ে দেয়। নাসরিন তাকে কোলে নেয়। আর তাকে কাঁধে ফেলে না না করে।

শাহিন তখন হিসু করে দিতে থাকে। নাসরিনের জামা ভিজে যায়। সে শাহিনকে কাঁধ থেকে মেঝেতে নামিয়ে দেয়। মাটির মেঝে। শাহিন সেখানে বসে পড়ে। নিজের মুতে নিজেই হাত দিয়ে থপথপ করে চাপড় দেয়।

নাসরিনের মনে হয়, বাচ্চাটার গালে মারে এক চড়। কিন্তু সেটা সে করে না। সে তাকে তুলে আবার কাঁধে নেয়, বিছানায় দাঁড় করায়, তার পরনের ভেজা প্যান্ট খোলে এবং আরেকটা প্যান্ট খুঁজে আনে দেয়ালে ঝোলানো দড়ি থেকে।

তখন সে দেখতে পায়, শান্ত (৪) ভেজা প্যান্টটা দিয়ে মেঝের কাদা মুছছে। নাসরিন চিৎকার করে ওঠে, ওই শান্ত, তুই কী করিস। মারিয়া কান ফাটি দিম।

বাইরে হইচই মতো শোনা যায়। নাসরিন শাহিনকে কোলে নিয়েই বাইরে আসে। তার পেছনে আসে শান্ত। গলির মুখে মোবাইল ফোনে একজন কথা বলছে, তার পেছনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কতগুলো বিভিন্ন বয়সের নারীপুরুষ।

লোকটা ফোন রাখে।

একজন বয়স্কা তাকে জিগ্যেস করেন, কী হইছে?

লোকটা বলে, আরে কেয়ামত হইয়া গেছে। কারখানার দশ তলা বাড়ি ভাইংগা পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ আছিল কারখানাতে। কোন কারখানা?

আরে সাভারের বড় রাস্তার উপরে।

নাসরিন প্রমাদ গোনে। তার খালা ওই কারখানায় ছিল না তো? তার বুক কাঁপে। কিন্তু সে মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দেয়, কত কারখানাই তো আছে বড় রাস্তায়। কোনটা ভেঙেছে, কে জানে। তবু সে দৌড় ধরে বিজলি খালার ঘর অভিমুখে, খালা খালা, সাভারত নাকি ফ্যাক্টরি বিল্ডিং ভাঙি পড়ছে...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনা কাজে যাওয়ার সময় নাসিমা, ফুলবানু আর রাশেদার দলে মিশে গেছে। মালতিরানী আর কৃষ্ণাকে তারা ডেকে নেয় তাদের ঘরের সামনে থেকে। তারা একই বিল্ডিঙে চাকরি করে বিভিন্ন কারখানায়। একসাথেই হেঁটে যায় কাজে, ছুটির শেষে একসাথে ফেরে।

নাসিমা, ফুলবানু আর রাশেদা একই ঘরে থাকে। তারা বিয়ে করেনি, তিনজনের একটা মেস, তাদের বয়স ১৬ কিংবা ২২। যদিও এই কারখানায় কেউ ১৮র নিচে কাজ করে না। কোনো কারখানাতেই করে না। অপুষ্টির শিকার মেয়েগুলোকে দেখে বোঝার উপায়ই বা কী, কে ১৬ আর কে ২৬। ১২/১৩ বলেও মনে হতে পারে প্রত্যেককে।

নাসিমা সারাক্ষণ হাসে। তার চুল কোঁকড়া, মুখখানা লম্বাটে, সে কাঠির মতো হালকা, তার চোখ দুটোও হাসে। জীবন আর জগৎটাকে সে পেয়েছে একটা হাসির উপলক্ষ হিসাবে। সে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়েছে তাদের গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে, তারপর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। যে কোনো ছাপানো জিনিস দেখা মাত্রই সে পড়তে শুরু করে। রাশেদা শ্যামলা, মাঝারি, আর ভীষণ পর্দানশীন, সারাক্ষণ ওড়না দিয়ে গা-মাথা পরিপাটি করে ঢেকে রাখে। সে সাধারণত কথা বলে না, কিন্তু যা বলে সেও খুবই একটা মজারই কোনো কথা।

ফুলবানু কালো কুচকুচে, কেন তার নাম ফুলবানু হলো, এই এক রহস্য, ফুল হলেও সে কালো ফুল। তার গড়নখানি সুন্দর, সে যখন শাড়ি পরে তাকে বেদেনির মতো লাগে।

মালতীরানী ধবধবে ফরসা, তার নাক টিকোলো, তার চোখ দুটো দুর্গাপ্রতিমার মতো। কৃষ্ণা শ্যামলা, বেটে, এবং তার চেহারার মধ্যে রয়ে গেছে একটা শিশু শিশু ভাব। সে যে গার্মেন্টসে চাকরি করতে পারে, এটা কল্পনাও করা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসিমা হাসতে হাসতে বলে, বল তো, আমাদের বিল্ডিংটা বেটা না বেটি?

সবাই চুপ করে গেল।

ফুলবানু বলে, দালানের কি আর পোলা না মাইয়া আছে? দালান হইল ক্লিব লিঙ্গ।

নাসিমা বলে, সব দালানের কথা হইতাছে নাগো। আমগো বিল্ডিং রানা প্লাজার কথা হইতাছে।

তখন রাশেদা বলে, আমগো বিল্ডিংয়ের নাম রানা। এইটা পোলাই হইব।

নাসিমা বলে, আমি একটা ইশারা দেই। এইটা ফাটা।

কেউ কোনো কথা বলে না।

নাসিমা বলে, বুঝলা না। আমগো দালানটা মাইয়া। এইটার ফাটা আছে।

তখন সবাই হৈহৈ করে ওঠে আর ওকে মার দেওয়ার জন্য উদ্যত হয়। নাসিমা দৌড়ে সামনে এগিয়ে যায়।

হাসনা বলে, বিয়াও হয় নাই তো, খালি আকথা কুকথা মুখত আইসে। বিয়াও হউক বুঝবে ঠেলা কাক কয়।

নাসিমা আবার ফিরে আসে, বলে, হাসনাবু, ঠেলা কারে কয়, তুমি তো খুব বুঝো। বুঝবা না। দুইটা পোলার মা কি আর এমনে এমনে হইছ। আমগো বিয়া হয় নাই, আমগো ঠেলা খাওনের সুখও নাই।

হাসনার মুখখানা লাল হয়ে যায়, সে বলে, এই তুই মুখটা বন্ধ করবু।

তখন রাশেদা ফোঁড়ন কাটে, হে কি আর মুখ বন্ধ করব, মুখটা না থাকলে তো অরে শিয়ালে টাইনা নিয়া যাইব।

নাসিমা থামার পাত্রী নয়, সে বলে, শিয়ালে টাইনা নিয়া গেলে খারাপ না। পুরুষ মানষে টাইনা নিয়া গেলেও একটা কথা হইত, শেয়ালে টাইনা নিয়া গেছে শুনলে মানষে কইবটা কী?

তারা ধীরে ধীরে কারখানার কাছে চলে আসে। তারা এতক্ষণ একটা ছোট রাস্তা ধরে আসছিল। বৈশাখের সকালটা রোদ ঝকমকে। আশে পাশে আরও কারখানা আছে। কারখানার শ্রমিকেরা সার বেঁধে কাজে যাচ্ছে। এর মধ্যেই একটা দুটো রিকশা ভ্যান গাড়ি চলছে। দেখেশুনেই পথ চলতে হয়। আজকে হরতাল বলে ভিড় কম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা বড় রাস্তায় ওঠে। এটা মহাসড়ক। হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো বাস-ট্রাক ছুটে চলেছে। হরতালের কারণেই রাস্তায় যানবাহনও কম। দু পাশে বড় বড় অট্টালিকা। কাঁচা বাজার খুলে গেছে। এখানে ভিড়ভাট্টার কমতি নাই। এর মধ্যেই তারা গিয়ে হাজির হয় কারখানার সামনে।

সেখানে জটলা। মনে হচ্ছে, এক ফোঁটা গুড়ে অনেকগুলো কালো পিঁপড়া দলা পাকিয়েছে।

শ্রমিকেরা আজ কাজে যোগ দেবে নাকি দেবে না, এই নিয়ে সংশয়। কেউ বলে, এই দালান যেকোনো সময় ভেঙে যাবে, এখানে কাজ করা নিরাপদ না। কেউ বলে, কাজ না করলে বেতন পাব কই। বিল্ডিং তো বাইরে থাইকা ভালোই দেখা যায়।

ভালো দেখা গেলে ব্যাংকের লোকেরা সবাই ব্যাংক বন্ধ কইরা পালাইছে কেন?

হে গো ব্যাংক বন্ধ থাকলেও হেরা মাইনা পাইব। আমরা কি কারখানা বন্ধ থাকলে বেতন পামু?

নানা ধরনের কথাবার্তা। এরই মধ্যে কেউ কেউ সিগারেট ধরিয়েছে।

রোদের মধ্যে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। তাদের লম্বা লম্বা ছায়াগুলোও দলা পাকানো।

কাজ হবে। চলো সর্দার নির্দেশ পেয়ে উঠে যায় বিজলির স্বামী নজিবর। সিঁড়ি বেয়ে উঠে কারখানার গেটে নিজের আইডি দেখিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে, নিজের কাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে। ঢুকে পড়ে হাসনা, নাসিমা, রাশেদা, ফুলবানু, মালতিরানী, কৃষ্ণা। ঢুকে পড়ে হাশেম, কামাল, জুঁই, ববিতা, কুলসুম।

কাজের সময় তারা বোঝে কাজ।

মাথার ওপরে গনগনে আলো। উজ্জ্বল পুরোটা কক্ষ। মেশিন নড়ছে। তারা সেলাই করে চলেছে। যার কাপড় কাটার কথা সে কাপড় কাটছে। যাদের বোতাম লাগানোর কাজ তারা বোতাম লাগাচ্ছে। হাতগুলো চলছে মেশিনের মতো, মেশিন চলছে ট্রেনের মতো, ঝিকঝিক ঝিকঝিক। চাকা ঘুরছে, ববিনের সুতো বেরিয়ে আসছে, সুতোর গুটি ঘুরছে বনবনিয়ে।

যখন তারা কাজে যায়, তখন তারা কাজেই নিমগ্ন হয়ে পড়ে। তখন প্রত্যেকে যেন একেকটা রোবট। তারা নিজেকে ভুলে যায়, ঘরবাড়ি ভুলে যায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা স্মরণে আনে না। তাদের চোখ একটুও সরানো চলবে না,

AMARBOI.COM

সেলাই

সুচের নিচে আঙুল, তাদের পঞ্চ-ইন্দ্রিয় সজাগ। একটু আগেও যে নাসিমা কলকল করছিল, সেও এখন চুপ, শুধু তার হাত নড়ছে। সেলাই চলছে।

নাসিমা সেদিন একটা ঠোঙায় পড়েছিল, ঠোঙাটার কাগজ ছিল একটা পত্রিকার, বাংলাদেশের মেয়েদের সেলাইয়ের হাত খুব ভালো, এর ঐতিহাসিক কারণ আছে। সেলাই হচ্ছে হাতের কাজ। বাঙালিরা সব সময় হাতের আঙুল ব্যবহার করে। তারা ভাত খায় আঙুল দিয়ে। তারা বাদাম ভাঙে আঙুল দিয়ে। তারা চাল বাছে আঙুল দিয়ে। আর তারা সূচীকর্মে সব সময়েই ছিল নিপুণা। এর ফলে বাঙালির আঙুলের সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্পর্ক অনেক প্রত্যক্ষ। এই কারণে বাঙালি সেলাইকর্মে ভালো করছে। গার্মেন্টসে বাঙালির ভালো করা নতুন ঘটনা নয়। বাঙালি হাজার বছর ধরে হাতে মিহি বস্ত্র বয়ন করে আসছে। মসলিন সারা পৃথিবীব্যাপি বিখ্যাত ছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফোন আসে বিজলির মোবাইলে। কল করেছে দাউদ ভাই। হাসনাবুর স্বামী। বিজলি কম্পিত হাতে ফোন ধরে। গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না। সে কোনো রকমে বলে, হ্যালো...

দাউদ ভাই বলে, বিজলিবু, সর্বনাশ হয়া গেছে। রানা প্লাজা বোধ হয় ভাঙ্গিয়া পড়ছে। হাজার হাজার মানুষ ভিতরে আটকা...

বিজলি আর কোনো কিছু শুনতে পায় না। সে অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে যায়।

বিজলির খবর তখন কে নেবে? তখন মানুষ সবাই ছুটছে সাভারের দিকে; রানা প্লাজা ধসে পড়েছে। দশতলা ভবন, ভেঙে একেবারে দোতলার সমান হয়ে গেছে। একটার পর একটা তলা বেবে গিয়ে ছাদগুলো একেবারে প্যাকেটের বিস্কুটের মতো নেমে এসেছে, গায়ে গা লাগানো দূরত্বে। এর মধ্যে ছিল হাজার হাজার মানুষ। চারটা পাঁচটা গার্মেন্টস কারখানা, আর মার্কেটের সার সার দোকান, দোকানগুলো অতো সকাল সকাল খোলেনি বলে হয়তো খানিকটা রক্ষা। কিন্তু গার্মেন্টসগুলো খুলে গেছে, আজকেই সবাইকে প্রায় জোর করেই ডেকে আনা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে, এই ভবন নিরাপদ, আপনারা সবাই কাজে যোগ দিন। একটা মাত্র কলামে ফাটল দেখা দিয়েছিল, একটা কলাম ভাঙলে বিল্ডিংয়ের কিছু হয় না। আর ভারী ছাদগুলোর নিচে নিচে মানুষগুলোর কী হয়েছে কে জানে, মানুষেরা কি সব পিষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পিঁপড়ার মতো, তাদের মাথার খুলি পায়ের পাতা মাংস মজ্জা মগজ প্লীহা ফুসফুস যকৃত হাতের চুড়ি কানের দুল পায়ের স্যান্ডেল তাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনা আনন্দ ও বেদনা ক্ষুধা ও কামনা হিংসা ও ভালোবাসা রক্ত ও রক্তস্বল্পতা হাড় ও চামড়া ও চুল ও দাঁত আর্তনাদ ও চিৎকার কান্না ও দীর্ঘশ্বাস সব দুমড়ে মুচড়ে পিষ্ট হয়ে একটা লেইয়ে পরিণত হয়ে গেছে? নাকি এখনও কেউ কেউ বেঁচে আছে, কারও হাত চাপা পড়েছে বিমের নিচে, কারও পা চাপা পড়েছে মেশিনের নিচে, কারও শরীরের অর্ধেকটা চাপা পড়ে আছে ইটের স্তূপের নিচে, মাথাটা খোলা পরিসরে, চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটো খোলা, সব দেখতে পাচ্ছে, মুখ হা করা, সে বিলাপ করছে?

রানা প্লাজার সামনে মানুষের ভিড়, আশে-পাশের লোকেরা ছুটে এসেছে যে যেখানে ছিল, টেলিভিশনে প্রথমে স্ক্রল তারপর নিয়মিত খবর তারপর স্পেশাল বুলেটিন প্রচার শুরু হয়ে গেছে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে লাইভ সম্প্রচার। অনলাইন মাধ্যমগুলো প্রচার করতে শুরু করেছে ছবি ও খবর ও ঘটনার মর্মন্তুদ বিবরণ। মোবাইল ফোনগুলো, বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের হাতে ১০ কোটি মোবাইল ফোন, কথা বলাবলি করছে! রানা প্লাজার পাশের ভবনের পোশাক কারখানা থেকে নারীশ্রমিক সালমা ও সুলতানা ও কাবেরি ও নিমাই ও আসলাম ও জসীম ও খোকা ও সাদ্দাম ও রবার্ট ফোন করছে নিমতলি ও বরিশাল ও রংপুর ও হালুয়াঘাট ও টেকনাফ ও রূপসা ও তেঁতুলিয়া ও পাথুরিয়া ও মোহাম্মদপুর ও নারায়গণগঞ্জ ও কক্সবাজার ও গণেশপুরে, ভাইজান আমি ভালো আছি, মা, মুই ভালা আছোম, বুবু হামি ভালা আছি, সগির বালা আছি! ও আল্লাহ ও খোদা এইহানে কেয়ামত হইয়া গেছে!

'ভাইজান, হুনো, কারখানা ভাইংগা পড়ছে, আটকা পইড়া আছি ভিতরে, তিনজন কুনু রহমে, এইটা কয়তলা, কুন জায়গা জানতাছি না, তুমি আহো তাড়াতাড়ি আমারে উদ্ধার করো ভাইজান।' ফোন বাজে কোন শেরপুরে।

'তপুর আব্বা, আমার তপুরে দেইখো, আমি মারা যাইতাছি আল্লাহগো, ফ্যাক্টরি ভাইংগা পড়ছে গো!' তারপর আর কোনো কথা নাই। তপুর আব্বা রিং ব্যাক করে, রিং বাজে, তপুর আম্মা আর ধরে না।

১৫ বছরের সোনিয়ার ভীতি ছিল উচ্চতায়। সে উঁচু বিল্ডিঙে প্রথম দিন উঠে ভয়ে সিটকে গিয়েছিল। একবার তার নুরপুরের বাড়ির টিনের চালে উঠে সে কাঁদতে শুরু করেছিল, তার বুক হাপরের মতো কেঁপেছিল, তার রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল; আর এই রানা প্লাজার আটতলায় উঠে সে জানালার কাছে যাচ্ছিলই না; তার ভয় ছিল বদ্ধ জায়গায়, সে এই ভবনের বাথরুমে যেতে ভয় পেত, বদ্ধ চার দেয়াল তার শ্বাস দিত আটকে, এখন সে একটা দুই ফুট বাই দুই ফুট জায়গায় কোনো রকমে মাথাটা রাখতে পেরেছে, তার শরীরের ওপরে কী কী সব ভার, ভবন ভাঙা ইট সিমেন্ট মেশিন টেবিল... সে শুধু প্রার্থনা করছে আমার জ্ঞান কেন চলে যাচ্ছে না, আমি অজ্ঞান কেন হচ্ছি না, আল্লাহ আমাকে তুলে নাও...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দমকল বাহিনীর গাড়ি এসে পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় মানুষেরা ছুটে যায় ধ্বংসস্তূপে। নিচের দুটো তলা মোটামুটি দাঁড়িয়ে আছে। কোনো রকমে একটা দুটো ফোকর বের করে ফেলতে পারলেই নিচের লোকগুলোকে উদ্ধার করা যায়। ওই উদ্ধারকারীদের উচ্চতা সাড়ে তিন হাত, হাত মাত্র দুটো, কিন্তু তাদের ইচ্ছাশক্তি আর মহত্ত্বের কোনো সীমা-পরিসীমা নাই, কাজেই তাদের শক্তি ও ক্ষমতা যেন অলৌকিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তাদের কোনো প্রশিক্ষণ নাই, কোনো যন্ত্রপাতি নাই, শিক্ষা নাই, সঙ্গতি নাই, কিন্তু আছে মনুষ্যত্ববোধ। তখনও ধুলাবালি সিমেন্ট ছাই উড়ছে আকাশে, মানুষের আর্তনাদে রানা প্লাজার হঠাৎ খালি হয়ে যাওয়া আকাশ অন্ধকার হয়ে আছে, তার ভেতরেই সামান্য ফোকর দিয়ে ঢুকে পড়ছে ওই অপেশাদার প্রশিক্ষণবিহীন উদ্ধারকারী স্বেচ্ছাসেবকেরা। ওই তো একজন মানুষ পড়ে আছে, প্রায় অক্ষত, কাঁধে তুলে নিয়ে তাকে ওই ফোকরের মুখ পর্যন্ত আনছে। মেঝেতে শুইয়ে রেখে হামাগুড়ি দিয়ে উদ্ধারকারী লোকটা বেরিয়ে যায় বাইরের আকাশের নিচে, আবার উল্টো দিকে মুখ করে মাথাটা ভেতরে ঢোকায়, ওই অচেতন শরীরটার পা ধরে টানতে থাকে, পা বেরিয়ে আসে, মাথা বেরুচ্ছে, তারপর আরো তিনজন উদ্ধারকারী বের করে ওই শরীরটাকে, কাঁধে করে নিয়ে যায় বাইরে, সাতজন ছুটে আসে পানি নিয়ে, চোখেমুখে পানি দেওয়া হচ্ছে ওই নারীর, যার গায়ের স্যালোয়ারের রং নীল, পায়জামার রং সবুজ। মেয়েটা চোখ মেলে। আমি কোথায়? উদ্ধারকারীর দলের চোখে তখন আনন্দের জল। একটা প্রাণ বোধ হয় বাঁচল। তাকে বাইরের মানুষজনের হাতে রেখে উদ্ধারকারী ওই যুবক আবার ছুটে যায়। মানুষকে বাঁচানোর নেশাও একটা নেশা, সেখানে চ্যালেঞ্জ যত বড়, মানুষের সেবার ব্রত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রণোদনাও যেন তত বেশি।

দমকল বাহিনীর উদ্ধারকারীরা এসে যায়, পুলিশ আসে, তারা উৎসুক জনতাকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য বাঁশি বাজায়, সৈন্যরা আসে, কমান্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে।

উদ্ধারকারীরা, প্রশিক্ষিত ও অপ্রশিক্ষিত, পেশাদার ও স্বেচ্ছাসেবক মিলে-মিশে চালিয়ে যায় মানুষকে উদ্ধার করার কাজ। কাজটা কঠিন। আপাত অসম্ভব। কোনো তল নাই, কোনো কিনার নাই। কোত্থেকে শুরু করবে মানুষ কাজ। সব দিক থেকেই উদ্ধারকারীরা চেষ্টা করছে। নিচে যদি দুটো কি তিনটা ফ্লোর অক্ষত থেকেই থাকে, তাহলে সেসবের দরজা জানালা ভেঙে ভেতর থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষগুলোকে বের করে আনার কাজটা চলুক। কাজ চলতে শুরু করে। ওপরে যদি বিমের আড়ালে, ভাঙা দেয়ালের নিচে মানুষ চাপা পড়ে থাকে, আর তার গোঙানি শোনা যায়, তাহলে একটু একটু করে এগোও। দেখো তো, ওই বিমটার নিচে নিজের মাথাটা কোনোমত ঢুকিয়ে দেখো ভেতরে কী অবস্থা। ওই পাশটা ফুটো করলে কি লোকগুলো বাতাস পাবে খানিকটা?

কেয়ামত ঘটে গেছে এইখানে। মহাপ্রলয়। কিন্তু উদ্ধারকারীদের তো সেইসব ভাববার সময় নাই। তারা কাজ করে চলেছেন। কারো মাথায় হেলমেট, পরিধানে ইউনিফরম, কারো পরনে লুঙ্গি মাথায় গামছা। তারা সামনে একটা মানবশরীর দেখছেন, সেটাকে বের করে আনার জন্য প্রাণপাত করছেন। হাতুড়ি এসে গেল। গাইতি শাবল। ওয়েল্ডিং মেশিন।

যাকেই উদ্ধার করা হচ্ছে, তাকে নিয়েই অ্যাম্বুলেন্স ছুটছে হাসপাতালে। হাতের কাছে এনাম হাসপাতাল। রোগী আসছে। কেউ সামান্য আহত, কারও বা একটা পা নাই। কেউ বা অচেতন, কেউ বা বিছানায় শোওয়ানো মাত্র উঠে পড়ে বলছে, আমি ঠিক আছি, আমি যাই। কিন্তু কেউ কেউ কোনো কথাই বলছে না। কথা বলবে না। তাদের শুয়ে রাখা হচ্ছে স্কুল কম্পাউন্ডের মাঠে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাউদ মিয়া ছুটে আসে তার মাইক্রোবাস নিয়ে। সাভারের দিকে। ঘটনাস্থলের কাছে যাওয়া যায় না। তার আগেই মানুষের ভিড়। দু পাশে গাড়ি কিছু সাইড করে রাখা। দাউদ মিয়া তার গাড়ি নিয়ে এগোতে পারে না। মাঝে মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসছে সাইরেন বাজিয়ে। লোকেরা সরে গিয়ে জায়গা করে দিচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সকে। টেলিভিশনের গাড়ি আসছে। পুলিশের গাড়ি। সরকারি লোকজনের গাড়ি। কিন্তু দাউদ মিয়া তার মাইক্রোবাস নিয়ে এগুতে পারে না। সে এত করে বলছে, ইমার্জেন্সি গাড়ি, সাইড দেন, সাইড দেন। কে কার কথা শোনে। শেষে দাউদ মিয়া গাড়ি এক পাশে পার্ক করে। দরজা ঠিকমতো লক করে সে হাঁটতে শুরু করে রানা প্লাজার উদ্দেশে। এক কিলোমিটার হাঁটতে হবে কমপক্ষে। মাথার ওপরে সূর্য গনগন করছে। মানুষ হাঁটছে। সেই মানুষের ভিড়ে গায়ে গা লাগিয়ে হাঁটে দাউদ। তার বউ হাসনার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। ফোন বাজে, কিন্তু কেউ ধরে না। দাউদ দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটে। মানুষের ঘাড় আর মাথা ছাড়া কিছু দেখা যায় না। দূর থেকে যে ভিড়টাকে মনে হয় নিশ্ছিদ্র ও অপ্রবেশ্য, কাছে গেলে দেখা যায়, তার ভেতরেও ঢুকে পড়া যাচ্ছে, কনুই দুটো ব্যবহার করে করে।

রানা প্লাজার কাছে চলে যায় দাউদ। সামনে তাকায়।

সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়। এইখানে একটা লাল রঙের ভবন ছিল। সেটা কই। জায়গাটা খালি খালি লাগছে। পেছনের আকাশ দেখা যাচ্ছে। বহুদিন সে বউকে নামিয়ে দিতে এসেছে এই রানা প্লাজার সামনে। এই রকমটা সে কখনও দেখেনি। এই রকম একটা দশতলা ভবন এই রকম করে ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতে পারে? ছোটবেলায় সে একবার তার বাড়ির সামনে একটা শিমুল গাছকে ঝড়ে ভেঙে পড়ে যাওয়ার পরে দেখেছিল। ঝড়ের পরে বাড়ির সামনে গিয়ে দেখে আকাশ পরিষ্কার, যেখানে একটা গাছ ছিল, তা নাই, কাণ্ডটা কিছুদূর ওপরে ভেঙে গেছে, গাছের মাথাটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাটিতে। একটা জায়গায় সে একটা গাছ দেখে আসছে জন্মের পর থেকে, সেই জায়গাটা ফাঁকা, যেখানে আকাশ থাকার কথা নয়, সেখানে এখন আকাশ। কেমন আর্ত লাগে না? আজ এই রানা প্লাজার মাথার জায়গাটাকে ফাঁকা দেখে দাউদ মিয়ার বুকটা দুমড়ে মুচড়ে যায়। সাতটা তালা ভ্যানিশ হয়ে গেল। তার বউকে কি সে পাবে তাহলে? প্রশ্নই ওঠে না। তার হাড়মাংস সব থেৎলে মিশে গেছে ধুলার সঙ্গে, সম্ভবত। আশঙ্কায় আতঙ্কে দাউদ মাথার চুল ছিঁড়তে থাকে।

কিন্তু তখন দেখা যায়, একজন নারী ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছেন, একজন উদ্ধারকারীর হাত ধরে। তার মাথায় ধুলা, তার চোখেমুখে আতঙ্ক, কিন্তু তিনি হেঁটে বাইরে এসে দৌড়াতে থাকেন। তারপর হাতের মোবাইলটার দিকে চোখ যায়, তিনি মোবাইলে ফোন করেন এবং হাসতে হাসতে বলতে থাকেন, মা, আমি বাঁইচা আছি। মা আমি বাঁইচা আছি। তার হাসি মিলিয়ে যায়, মুখটা কাতর দেখায়, তার চোখ দিয়ে জল গড়ায়, সে আবার বলে, মা গো আমি বাঁইচা আছি গো মা।

ঠিক তখনই, দাউদের পাশে, একজন বিশ-বাইশ বছরের যুবক, বোধ হয় ছাত্র, তার গায়ে নীল শার্ট, পরনে খাকি প্যান্ট, পেছনে ব্যাগ, হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে।

দাউদ ভিড় ঠেলে সামনে যায় এবং উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। সে প্রথমে ভেবেছিল, তিনতলার ছাদের নিচের সামান্য পরিসরটার ভেতরটায় সে ঢুকবে এবং তার স্ত্রী হাসনাকে শনাক্ত করবে। কিন্তু কাজে নেমে সে সব ভুলে যায়, সামনে যাকে পায়, নারী বা পুরুষ, জীবিত বা মৃত, তাকেই উদ্ধার করার নেশা তাকে পেয়ে বসে। অন্ধকার ঘুপচিতে, যেখানে গরমে সেদ্ধ হতে হয়, দম আটকে আসে, যেখানে শরীর ঘোরানো যায় না, শুধু শুয়ে পড়ে অতিকষ্টে সামনে এগুনো যায়, যেখানে ড্রিলিং করে একটা দেয়াল সরানো হচ্ছে আড়ালে থাকা মানুষটাকে বের করে আনার জন্য, যেখানে ওই ড্রিলিং ধ্বংসস্তূপের ভারসাম্য নষ্ট করে ঘটাতে পারে নতুন বিপর্যয়, সেখানেই চলে যাচ্ছে দাউদ।

উদ্ধারকারী দমকল কর্মীদের লিডার আসমত সাহেব, বৃদ্ধ, তোবড়ানো গালে দাড়ি, কমলাটে কমবাটের ইউনিফরম, মাথায় হেলমেট, চোখের কোনে ছানি। তার সঙ্গে সাবের, মিলন, জামান। সাবেবের গালে মেছতা, দাড়ি গোঁফ নাই, মিলনের মাথায় চুল কম, ঠোঁট লাল। জামান লম্বা, ফরসা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহেবদের মতো দেখতে। কিন্তু প্রত্যেকেই শুকনা পটকা। সরকারি চাকরিতে এদের বেতন নামমাত্র, আর দমকলে থাকলে আর যাই পাওয়া যাক, ঘুস পাওয়া যায় না। প্রত্যেকেরই শরীরে অপুষ্টির চিহ্ন, হেলে পড়া কাঁধে সংসারের দায় বহনের ভার। কিন্তু কর্তব্যে তারা নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমে ক্লান্তিহীন, নিজের জীবনের মায়া বলতে তাদের কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসমত সাহেবের নেতৃত্বে সাবের, মিলন, জামানের সঙ্গে ক্রমাগত খাটতে থাকে দাউদও।

হঠাৎ তার মনে হয়, গাড়িটা পড়ে আছে রাস্তার ধারে, অন্তত অফিসে খবর দেওয়া দরকার। তখন সে ফোন করে অফিসের আরেক ড্রাইভার কাদেরকে। বলে, রানা প্লাজার কাছে আসো, আমি এইখানে কাম করতাছি, তুমি চাবিটা নিয়া যাও, গাড়ি থুইছি হাশিম পাওয়ার পাম্পের বগলত, আসিয়া চাবিটা নিয়া গাড়িটা গ্যারাজত ধরি যাও।

তারপর আবার মনে হয়, তার ছেলে দুটো, শান্ত ও শাহিনের কথা, তার ভাগ্নি নাসরিনের কথা, কিন্তু তার বউকে উদ্ধার না করা গেলে ওদের সামনে সে যাবেই বা কী করে?

কাদের আসে এক সময়, তারে দাউদ বলে, মোর বাড়িত একনা যাইয়েন বাহে, মোর ছাওয়া দুইটাক একনা দেখি থোন। কন বলে মুই ভালো আছোম। মুই আসিম অ্যালা বাড়িত। চাবি নিয়ে চলে যায় কাদের।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজলির জ্ঞান ফেরে। সে দেখে সে তার নিজের বিছানায় শুয়ে আছে। তার পেটের ব্যথাটা বাড়ে। শ্বাস নিতে ভীষণ কষ্ট হয়। সে চিৎ হয়ে শুয়ে ছাপড়ার ছাদ দেখে। টিনের নিচে বাঁশের চাটাই। টিনে পড়া রোদের গরম যাতে ঘরের ভেতরে কম আসে, সেই জন্য এই ব্যবস্থা। সেই চাটাইয়ে মাকড়সার জাল। একটা মাকড়সা জাল বানিয়ে একটা মিহি সুতা ধরে একবার নামছে একবার উঠছে।

কারখানার দালান ভেঙে গেছে। তার স্বামী নজিবরের কোনো খবর নাই। বিজলি তার স্বামীর মোবাইল নম্বরে আবার ফোন করে। রিং বাজে না। তার স্বামী কি বেঁচে আছে? নাকি মারা গেছে? বেঁচে থাকলে ফোন বাজবে না কেন? তার স্বামীর হাত দুটো কি চাপা পড়ে আছে ভাঙা দেয়ালের নিচে। আসলে তার জ্ঞান আছে। তাকে উদ্ধার করা হলে সে বেঁচে যাবে?

বিজলি আস্তে আস্তে বিছানায় বসে। দেয়াল ধরে ধরে ঘর থেকে বের হয়। ঘরে তালা দেয়। পাশের ঘরে যায়।

নাসরিন রান্না চড়িয়েছে। শান্ত ও শাহিন ঘরের মেঝেতে বসে আপন মনে খেলছে।

বিজলি বলে, ও নাসরিন। কোনো খবর পালু?

নাসরিন বলে, না খালা। খালু গেছে কারখানাত। খালাক উটকায়।

দুই ঘর পরে একটা টেলিভিশন আছে। লোকমানের বাড়ি। তার বউও আরেক গার্মেন্টসে কাজ করে। লোকমান কাজ করে নাইট গার্ডের। তার ডিউটি রাত্রিবেলা। সারারাত ডিউটি করে সকালে সে ঘুমাচ্ছিল। এখন বস্তির লোকজন এসে তাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। ওই লোকমান, ঘুম থাইকা উঠো। টেলিভিশনটা অন করো। রানা প্লাজা দেখায়। আমরা দেখি।

লোকমান ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়ায়। ঘটনা প্রথমে কিছু বোঝে না। টেলিভিশন (১৪ ইঞ্চি, রঙিন) ছাড়লে তাতে রানা প্লাজার দৃশ্য দেখে সে চমকে ওঠে।

তার ঘরে টেলিভিশনের সামনে ভিড় জমে যায়।

নাসরিন বলে, খালা, লোকমান চাচার ঘরত টেলিভিশন আছে। অটে সোগ দেখাইতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোগ কী?

ওই যে কারখানার দালান যে ভাঙি গেছে, সেইগুলান দেখায়।

শান্ত বলে, খালা, চলেন তোমাক নিয়া যাই লোকমান চাচার ঘরত। টেলিভিশন দেখিবেন।

চল তো বাহে।

শান্তর হাত ধরে ধীর পায়ে হেঁটে বিজলি লোকমানের ঘরে উঁকি দেয়। লোকমান তাকে দেখে ডাকে, ভাবি আসেন আসেন। নজিবর ভাইয়ের কোনো খবর পাইলেন?

না বাহে। কোনো খবর তো পাই না। ফোনও তো যায় না।

খবর পাওয়া যাইব। দাউদ ভাই তো ওইহানে মানুষ বাঁচানোর কামে লাইগা পড়ছে। নজিবর ভাইও হয়তো সেই কামই করতাছে।

বিজলি মনে মনে বলে, তাই যেন হয়। নজিবর যেন সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে আসে। আচ্ছা ফিরে না আসুক, সে যেন খবর দেয় যে সে ভালো আছে। সে বেঁচে আছে।

বিজলির চোখ টেলিভিশনের পর্দায় আটকে যায়।

হায় হায় সে কী দেখছে। এই কি তাদের সেই কারখানা বিল্ডিং? এটা তো একেবারে ভেঙেচুরে ধসে একাকার হয়ে গেছে। এই বিল্ডিঙের মধ্যে যারা আছে, তারা বাঁচবে কী করে। সবাই মারা গেছে নিশ্চয়ই।

কিন্তু টেলিভিশনে বলছে, লাশ উদ্ধার হয়েছে ৪০ জনের, জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে দুইশ জনকে।

একজন একজন মানুষকে স্ট্রেচারে তুলে আনা হচ্ছে, আর লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে নিয়ে তুলে দিচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে। দুই শ জন বেঁচে আছে। তাদের মধ্যে কি তার স্বামী একজন হতে পারে না? তাহলে সে ফোন ধরে না কেন? হয়তো ফোনটা ভেঙে গেছে। হয়তো হারিয়ে গেছে। হয়তো নজিবর এখন হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে আছে। তার তেমন কোনো ক্ষতি হয় নাই। হয়তো বাম পায়ের বুড়ো আঙুলে একটু চোট লেগেছে।

নজিবর ফিরে আসবে না? তার যদি ছেলে হয়, তাহলে যে নাম রাখা হবে সাকিব।

টেলিভিশন খবরের ফাঁকে বিজ্ঞাপন দেখানো হচ্ছে। মানুষ বাঁচে আশায়, দেশ বাঁচে ভালোবাসায়।

বিজলি সেই বিজ্ঞাপন দেখে।

তার আশা মরে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজলির শরীর চলে না। বিজলির সমস্ত অস্তিত্বই যেন ভেঙে পড়েছে রানা প্লাজার সঙ্গে। সে কথা বলে না। সে কাঁদে না। সে স্তব্ধ হয়ে থাকে। নজিবর আসে না কেন। তার কেমন যেন লাগে। বাড়ি থেকে ফোন আসে। মা ফোন করেছে। মা বলে, বিজলি, জামাইয়ের কোনো খবর পালু?

না, মা, পাওঁ নাই।

মা ডুকরে কেঁদে ওঠেন। বিজলির কথা বলতে কষ্ট হয়। কাঁদতে কষ্ট হয়। বাইরে কুকুর ডাকছে।

এর মধ্যে মোবাইল ফোনে মার কান্না। বিজলি বলে, 'মা, কান্দো ক্যান? তোমার জামাই নিশ্চয় ভালো আছে। খবর পাওঁ নাই, খবর পামো। তুমি কান্দো ক্যান?'

মা বলে, তোর শরীলটা ক্যামতন?

বিজলি বলে, আর মোর শরীল, মুই শরীল দিয়া কী করিম?

মা বলে, মুই আইজকা আইতত সাভার বুলি আসতেছোম। তুই কান্নাকাটি না করিস জানি।

'তোমরা আসি কী করমেন?'

'তুই এই পোয়াতি শরীল নিয়া একলা একলা কী করবু? তার চায়া মুই আসোম, তোক দেখি থো।'

'তুমি একলা একলা আসিবার পারিবা? নাকি হিরুক ধরি আসবা?'

'হিরুক ধরি আসা যায়। তাইলে ফির ঘরদোর কায় দেখিবে। হাঁসমুরগি কয়খান। বকরি দুইখান।'

'আচ্ছা যা পারেন করেন। মুই আর কিছু কবার পারমো না।'

বিজলি ফোন রেখে দেয়। সারাটা দুপুর সে টেলিভিশন দেখেছে লোকমান ভাইয়ের ঘরে। বিল্ডিং ভাঙার খবর। মানুষজন উদ্ধারের খবর। কতজন মানুষ মারা গেছে, সেই খবর।

এই খবর সহ্য করা যায়? তার পেটের ভেতরটা মোচড়ায়, নাড়িভুড়ি উগলে আসতে চায়। তার শরীরে অবসাদ নেমে আসে। তার চিন্তা করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শক্তি বিলোপ হয়ে যায়। সে আবার নিজের ঘরের দিকে আসে।

খানিকক্ষণ শুয়ে থাকে একা একা।

পেটটা ওপর দিকে। বুকটা ওঠানামা করছে। বাঁশের চাটাইয়ে একটা টিকটিকি।

মা ফোন করে আবার। মা বলে, বিজলি, জামাইয়ের খবর পাইছিস?

না, মা।

মা বলে, শোন মুই মানত করছম। জামাই ফিরি আসলে মুই একটা খাসি কুরবানি দেম। জানের সদকা। আল্লাহ আল্লাহ কর।

বিজলি বলে, আল্লাহ আল্লাই তো করতেছি।

এগারো বছরের নাসরিন একা একা ভাত রাঁধে কী করে? রোজ সকালে খালা ভাত রেঁধে রেখে যায়। সেটাই নাসরিন দুপুরবেলা খায়। শান্ত খায়। নাসরিনই শান্তকে ভাত তুলে খাওয়ায়। দিনের বেলা এইভাবেই গেল। এখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। খালার আসার কথা। কিন্তু খালা তো আসে না। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামে। অন্ধকার হয়ে আসে চারপাশ। ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে। শান্ত কাঁদে, মা মা করে। শাহিন কেঁদে কেটে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। এই তিনটা বিভিন্ন বয়সী শিশু এই রাতটা কীভাবে কাটাবে?

হাসনা আসে না। দাউদও আসে না। দাউদ রানা প্লাজায় উদ্ধারের কাজ করে চলে। তার কোনো বিরাম বিশ্রাম নাই?

নাসরিন ভাত রাঁধতে বসে।

ভাতের চাল ধুতে গিয়ে তার মনে হয় বিজলি খালার কথা। বিজলি খালা একা একা কী করে। নজিবর খালুও তো ফেরে নাই। বিজলি খালা পোয়াতি পেটটা নিয়া নড়তে চড়তে পারে না। টেলিভিশনে বিল্ডিং ভাঙার খবর দেখে তো খালা একেবারে মড়ার মতো হয়ে গেছে। খালার খোঁজখবরও একটু নেওয়া দরকার। শান্তর হাত ধরে নাসরিন যায় বিজলির ঘরে। ও খালা, তোমার খবর কী? নাসরিন দরজা ঠেলে ভেতরে উঁকি দেয়।

নাসরিন বলে, কোনো খবর আছে?

বিজলি বলে, কী খবর চাস?

খালুর কোনো খবর পাইলেন?

বিজলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, নারে। কিছুই তো জানোম না। হাসনাবুর কোনো খবর পাওয়া গেইছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসরিন মাথা নাড়ে, না। পাওয়া যায় নাই।

দাউদ ভাই আসচে? বিজলি জিগ্যেস করে।

নাসরিন বলে, আসে নাই। একনা ফোন করি দেখেন তো!

বিজলি তার মোবাইল ফোনটা হাতে নেয়। টিপে টিপে ফোন করে দাউদের নম্বরে। রিং হয়। দাউদ ফোন ধরে না।

'তোর খালু তো ফোন ধরে না নাসরিন।'

'এলা মুই কী করোম কন তো। খালা নাই। খালু নাই। দুই দুইটা বাচ্চা ছাওয়া নিয়া মুই এখন কী করোম?'

'ভাত পাক করছিস?'

'না করোম নাই।'

'ভাত পাক কর। চাউল আছে।'

'আছে। মুই আসনু তোমার ভাত কাঁয় রান্ধিবে। মুই একনা চাউল বেশি করি দেই। হামরা এক সাথে খাই?'

বিজলির ক্ষুধা নাই। সে বলে, 'না লাগিবে না। মোর ভোক লাগে নাই। তোমরা খান।'

নাসরিন এসে বিজলির হাত ধরে। বলে, 'তোমার না ভোক লাগে নাই, তোমার প্যাটত একখান ছাওয়া আছে না? তার লাগি তো তোমাকে খাওয়া লাগিবে।'

কী অপার্থিব দৃশ্য। মাথার ওপরে ষাট পাওয়ারের ফিলিপস বাতি। বাতি ঘিরে কতগুলো পোকা। একটা টিকটিকি সেই পোকার আশে-পাশে ওৎ পেতে আছে। নিচে একটা ছোট্ট ঘরে দুটো মানবী। একজন সন্তানসম্ভবা, তার অগ্রগামী পর্যায়। আরেকজন বছর এগারোর বালিকা। তারা পরস্পরের হাত ধরে আছে। বালিকা যেন এই মুহূর্তে জননীর স্থান অধিকার করেছে।

বিজলি বলে, মা রে। আল্লাহ তোর ভালো করুক। তুই নিজেই একটা বাচ্চা ছাওয়া। মোরই উচিত আছিল তোর খোঁজখবর করা। তোর লাগিয়া ভাত পাক করি দেওয়া। আর তুই আসি মোর খোঁজ নিতোছিস মাও। আল্লাহ তোর খুব ভালো করিবে।

তাইলে হামরা একসাথে খাইম আইজ। নাসরিন চুলের বেণী দুটো দুলিয়ে যায়। বিজলি বলে, মায়ো, তাইলে কৌটাত থাকি চাউল ধরি যা কেনে। আলু আছে, আর কী কী তরকারি আছে। ধরি যা মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসিমা শুয়ে আছে হাই স্কুলের মাঠে। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন নাই বললেই চলে। মাথার পেছনে বোধ হয় আঘাত লেগেছে, তাতেই সে মারা গিয়ে থাকবে। শরীরের আর কোথাও কোনো আঘাতের চিহ্ন নাই। তার হাতেই পাওয়া গেছে মোবাইল ফোন আর একটা ছোট্ট ব্যাগ। ছোট ব্যাগের ভেতরে টিফিন বক্সে রুটি তরকারি আর একটা চিঠি। নাসিমার ব্যাগে মোবাইল ফোন, টিফিন ইত্যাদির পাশে একটা চিঠিও আছে। চিঠিটা সে লিখেছে তার মাকে।

সেই চিঠিতে লেখা:

মা,

আশা করি ভালো আছ। তোমার গ্যাস্ট্রিকের ব্যথাটা বেড়েছে শুনে খুব চিন্তিত আছি। মা, তুমি কি ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করো না। তোমার অবশ্যই ডাক্তার দেখানো উচিত। টাকা যা পাঠাই, সেখান থেকে কিছু কি বাঁচে না। কিছু কিছু জমিয়ে তুমি অবশ্যই ডাক্তারের কাছে যাবে। না হয় আমি এই মাসে একটু বেশি টাকাই পাঠাব। মা, তুমি কি আমিনাকেও ঢাকা পাঠানোর কথা ভাবছ? তাকেও গার্মেন্টসে দিয়ে দিতে চাও? আমার মনে হয়, সেটা ঠিক হবে না। ও তো পড়ালেখায় ভালো, ওকে পড়া চালিয়ে নিতে দেওয়া উচিত। ওর বয়স কম, গার্মেন্টসের কঠিন কাজ ও করতে পারবে না, এই গরম, এই প্রচণ্ড আলো, এই এক মনে সুচের দিকে তাকিয়ে থাকা, এই সকালসন্ধ্যা পরিশ্রম ও করতে পারবে না। আমাকে নিয়ে ভেবো না, আমি ওর চেয়ে বড়, আমি পারি, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। আমি এই মাসে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে ৬০০ টাকা পাঠাচ্ছি। বেতন বাড়ানোর কথা চলছে। যদি বাড়ে, সামনের মাস থেকে তোমাকে বেশি করে টাকা পাঠাতে পারব।

আক্কাস কত বড় হলো মা? সে কি আমার কথা বলে? আমাদের কারখানা বন্ধ থাকতে পারে দিন সাতেকের জন্য। বিল্ডিঙে ফাটল ধরা পড়েছে। মিস্ত্রি ডেকে সারাতে সারাতে সাত দিন তো লাগবেই। তাহলে আমি বাড়ি যেতে পারব। আক্কাসের জন্য কী লাগবে মা? আচ্ছা আমি মোবাইল ফোনে কথা বলে নেব। বাবার খবর কী? উনি কি এখনও বিয়ে করার জন্য পাগল হয়েই আছেন। আমাদের এখানে একজন মহিলা ফকির আছে, এলেম দ্বারা তাবিজ করে। আমি তার কাছ থেকে তোমার জন্য একটা তাবিজ নিয়ে আসব। তুমি সেটা বাবার বালিশের মধ্যে পুরে রাখবা। আর বাবার মন উচাটন হবে না। সে আর বিয়ের কথা ভুলেও মুখে আনবে না।

মা, তোমার আগের চিঠিতে তুমি কী বলতে চেয়েছ? কিসের ইঙ্গিত দিয়েছ? তোমার ধারণা আমরা এখানে খালি মজা করে বেড়াই। রঙ-তামাসার জীবন আমাদের? সেই সকালবেলা দুইটা রুটি আর কিছু তরকারি টিফিন বক্সে নিয়ে বের হই, সেই সন্ধ্যার আগে মুক্তি নাই। কী রকম তীব্র আলো জ্বলে ঘর জুড়ে, কী রকম রোশনাই, তুমি এই ঘরে একদিন থাকলেই তোমার চোখ জ্বলে পুড়ে যেত, তুমি আন্ধা হয়ে যেতে। তারপর শুধু কাজ আর কাজ। মেশিনের মতো কাজ করি। কোনো বিরাম নাই। বিশ্রাম নাই। আমি বলে পারছি। বাথরুমে পর্যন্ত যাওয়া যায় না জরুরি প্রয়োজন ছাড়া। কারো সাথে কথা বলারও কোনো উপায় নাই। সন্ধ্যায় যখন ছুটি পাই, ঘরের দিকে ছুটতে থাকি। কার দিকে তাকাব? কার কথা ভাবব। কোনো রকমে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকতে পারলে না বাঁচি। মা, খেজুরভিটায় মুন্সির ভেড়াগুলো কীভাবে চরে তুমি নিশ্চয়ই দেখেছ। একট ভেড়ার পেছনে মাথা গুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরেকটা ভেড়া চলে। তারা আর কিছু দেখে না, সামনে একটা ভেড়া ছাড়া। আমরাও পথ চলি এইভাবে। একজনের পেছনে আরেকজন ছুটতে থাকি। ভেড়ার পালের মতো। দল বেঁধে। অন্য কোনো দিকে তাকানোর কোনো উপায় নাই। আমাদের শিফট শেষ হলে আমরা হুড়মুড় করে নামি। সিঁড়ি বেয়ে। রাস্তায় নামি। একজনের গায়ের সঙ্গে আরেকজন লেগে থাকি। আমরা ছুটতে থাকি। রাস্তার বখাটে ছেলেরা নানা রকমের ফোঁড়ন কাটে। আজে বাজে কথাও হয়তো বলে। কে সেসব কানে দিচ্ছে। ওরা নিজেরাই বলে, নিজেরাই শোনে। আমরা পাত্তা দেই না। আমরা ছুটতে থাকি নিজ নিজ ঘরের দিকে। কারখানার সামনের রাস্তায় তখন শুধু আমরাই। বড় রাস্তা থেকে গলিতে ঢুকি। শুধু আমরাই। কারখানার শ্রমিকেরা ছুটছি। তারপর বাড়ির কাছে, বস্তির কাছে এলে ভিড় খানিকটা কমে। আমরা যার যার ঘরে ঢুকে যাই। রান্না করতে হবে। কেনাকাটা করতে হলে দোকানে যেতে হবে। কোটা বাছা। কোনো কোনো দিন কাপড় কাচা। তারপর খেয়েদেয়ে বাসনকোসন ধুতে ধুতে শরীর আসে ভেঙে। গা এলিয়ে পড়ে। বিছানায় গা রাখা মাত্র ঘুম। এইভাবে একটা দিন যায়। আরেকটা দিন আসে। রঙ রসিকতা করার সময় নাই, ফুরসতই বা কোথায়?

আমি আজ পর্যন্ত কোনোদিন এখানে সিনেমা হলে গিয়া সিনেমা দেখি নাই।

তোমাকে মিথ্যা বলব না। কুলসুমের ভাই এসেছিল। তার সাথে কুলসুমসহ আমরা একদিন বাজারে গেছলাম। কুলসুমের ভাই আমাকে একটা ঘড়ি কিনে দিয়েছিল। বলে, গার্মেন্টস এর কাজ ঘড়িধরা। তোমার একটা ঘড়ি লাগবে। না হলে ঠিক সময়ে আসবা কেমন করে। একটা ঘড়ি তুমি নাও। আমি তার মুখের উপরে কিছু বলতে পারি নাই। সে চলে গেলে ঘড়িটা কুলসুমকে ফেরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে এসেছি। আমি কেন অন্যের দেওয়া ঘড়ি নিতে যাব। আমাদের ঘড়ি লাগে না। শরীরই ঘড়ি হয়ে গেছে। আমরা কী গ্রীষ্ম কী শীত ঠিক সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারি। ঠিক সময়ে বের হয়ে আসতে পারি কারখানায়। আমাদের ঘড়ি লাগে না। আমাদের ক্যালেন্ডার লাগে না। বর্ষা আসে বৃষ্টি নিয়ে। কেমন করে কাজে যাব? ছাতা মাথায় দৌড় ধরি, ভিজে যাই, তবু ঠিক সময়েই যাই পৌঁছে। শীত আসে। কুয়াশায় রাস্তাঘাট দেখা যায় না। একটা শালে গা মাথা আবৃত করে আমরা ছুটতে থাকি। ঠিকই পৌঁছে যাই কারখানায়।

আমাকে নিয়ে তুমি ভেবো না। একদমই না। আমি কখনও বিয়ে করতে যাচ্ছি না। তুমি প্রতিমাসে ঠিক সময়েই টাকা পাবা। আমিনা যেন পড়াশোনা বন্ধ না করে। আমি চাই না সে এই বয়সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে গার্মেন্টসে চাকরি নিক। সে ম্যাট্রিক পাস করবে, আইএ পাস করবে। ভালো চাকরি করবে। আব্বাস বড় হবে। তোমার দুশ্চিন্তা দূর হবে। তারা আয় রোজগার করে তোমার দুঃখ দূর করবে। তখন আমি ভেবে দেখব আমি বিয়ে করব কি করব না। তার আগে আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি না। তোমাকে অগাধ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে আমি আমার নিজের সুখের ঠিকানা খুঁজে নিতে পারি না। তোমার নাসিমা সেই রকম মেয়ে না মা।

আমাদের দিন চিরকাল এমন থাকবে না। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদের সুদিন দেবেন।

ইতি তোমার আদরের নাসিমা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাশেদা শুয়ে আছে এনাম হাসপাতালের বিছানায়। তার জ্ঞান আছে একটু একটু। তাকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে।

তার পা চাপা পড়েছিল একটা থামের নিচে। সে সহ্য করতে পারছিল না।

একজন উদ্ধারকর্মী সাবেরের টর্চের আলো রাত ১২টার দিকে তার ওপরে পড়ে। তখনও তার মাথায় ওড়না।

সাবের এসে রাশেদার নাকে কান পাতে। মনে হয় বাঁইচা আছে, সাবের বলে। পেছনে সুড়ঙ্গের মাথায় উদ্ধারকর্মী মিলন বলে, আরেকজন বাঁইচা আছে এখানে।

রাশেদার মুখে সাবের পানির বোতল থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে পানি ঢালে। রাশেদা মুখ নেড়ে জিভ করে পানি চাটে।

সাবের বলে, আপনার ভয় নাই। আমরা আপনাকে নিতে আসছি।

রাশেদা বলে, খুব ব্যথা, পা নড়াইতে পারি না।

সাবের বলে, আপনার পায়ের উপরে থাম পড়ছে। মনে হয় পা থেতলাইয়া গেছে।

রাশেদা বলে, পা কাইটা আমারে বাইর নিয়া যান।

সাবের বলে, সেইটাই মনে হয় একমাত্র বুদ্ধি। আপনি সহ্য করতে পারবেন।

পারুম।

দেখি, ডাক্তার পাই নাকি। ডাক্তার পাইলে আপনেরে ইনজেকশন দিয়া পা কাটাইয়া নিব।

রাশেদা বলে, ভাই আপনি আমারে ছাইড়া যাইবেন না।

সাবের সজল চোখে বলে, না, যামু না। আমরা তো আপনেরে বাঁচানোর লাইগাই আইছি। আপনেরে ছাইড়া যামু কেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাশেদা শুয়ে আছে। চিৎ হয়ে। পা দুটো চাপা পড়া। পরিসরটাই খুব ছোট। সাবেরও আছে শুয়ে। উপুর হয়ে। সাবেরের মাথা রাশেদার মাথার দিকে। অন্ধকার জায়গাটা। টর্চের আলো নিভে গেলে আর কিছু দেখা যায় না। আবার সুইচ খুঁজে আলো জ্বালে সাবের।

এবার সে আস্তে আস্তে পিছায়। হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে সে চলে আসে আরেকটা বড় পরিসরে। যেখানে তাদের নেতা আসমত সাহেব অপেক্ষা করছেন। সে বলে, স্যার, আপনার পারমিশন লাগবে স্যার। একজন মহিলার দুই পা চাপা পড়ে আছে স্যার। পা দুইটা কাটলে মহিলা বাঁচবে স্যার।

কিসের নিচে চাপা পড়ছে। সেটা সরানো যায় না।

সেটা সরাইতে হইলে স্যার গোটা বিল্ডিং সরাইতে হবে। উপরে তো ছয়টা ছাদ। একটার উপরে একটা। পা থেৎলে শেষ হয়ে গেছে স্যার। পা দুইটা এমনিতেই বাঁচব না।

উনি কি অনুমতি দিবেন?

উনিই রিকোয়েস্ট করতেছে স্যার।

তাহলে কী করবেন।

পা কাটব স্যার।

আপনি কাটবেন?

আমি না কাটলে কোনো ডাক্তার দেন।

AMARBOI.COM

আপনার ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে কোনো ডাক্তার ঢুকবে না। কোনো ডাক্তারকে ওইখানে ঢুকতে আমরা বলতেও পারি না।

তাইলে স্যার পা কাটার যন্ত্র দেন। আর মহিলারে অবশ করার ইনজেকশন দেন।

পা কাটার যন্ত্র কোথায় পাবে কে? লোকাল এনেসথেসিয়ার ইনজেকশন অবশ্য পাওয়া যায়। হাতের ওয়াকিটকিতে আজমত সাহেব চেয়ে পাঠান ইনজেকশন। ১৫ মিনিটের মধ্যে সেটা এসে যায়।

সাবের ভেতরে ঢোকার আগে আকাশের দিকে তাকায়। এই এলাকায় ফ্লাশলাইটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেনারেটরের চলার শব্দ হচ্ছে। আকাশ তুলনায় অন্ধকার। কতগুলো তারা মিটিমিটি জ্বলছে। সাবের পানি খেয়ে নেয় বোতল থেকে। তারপর মাথায় টর্চ লাইট, পিঠে যন্ত্রপাতি নিয়ে সে ঢুকতে থাকে ফোকড়ের মধ্যে। তার পায়ের সাথে দড়ি বাঁধা হয়েছে। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেই যদি বিপদে পড়ে তখন তাকে দড়ি ধরে টেনে বের করা হবে।

সাবের আবারও হামাগুড়ি দিচ্ছে।

রাশেদার কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় সে। সাবেরের পিঠে অক্সিজেনের ছোট সিলিন্ডারও দেওয়া হয়েছে। প্রথমে সে অক্সিজেন সিলিন্ডারের মুখ খুলে কিছু অক্সিজেন বেরিয়ে যেতে দেয়। তারপর মুখটা ভালো করে লাগায়।

হাতে লোহা কাটার, কংক্রিট কাটার করাত। সে রাশেদার মাথার ওপর দিয়ে নিজের মাথাটা রাশেদার পায়ের কাছ পর্যন্ত নেয়। এ ছাড়া কিছু করার নাই। সে ইনজেকশন ঢুকায় রাশেদার দুই উরুতে। তারপর হাতের করাত রাশেদার হাঁটুর ওপরে চালাতে থাকে। তখনও রাশেদার পরনে হলুদ রঙের সালোয়ার। তার ওপর দিয়েই সাবের করাত চালায়। রক্ত ঝরে। হলুদ সালোয়ার লাল হয়ে যায়। মেঝেতেও রক্ত গড়ায়। ফিনকি দিয়ে ওঠা রক্ত এসে পড়ে সাবেরের কপালে।

রাশেদা অজ্ঞান হয়ে যায়। দুই উরু আছে। পা দুটো নাই।

রাশেদাকে টেনে টেনে সুড়ঙ্গের মুখে আনে সাবের। তারপর সে নিজেই অজ্ঞান হয়ে যায়।

উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি বোঝে মিলন। সে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে বের করে সাবেরকে। তারপর মাথা ধরে টেনে আনে রাশেদাকে।

রাশেদার অচেতন দেহ বাইরে এলে তিনচারজন উদ্ধারকারী তাকে ধরে বাইরে দাঁড়ানো অ্যাম্বুলেন্সের দিকে নিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধরচন্দ্র বিদ্যালয়ের ভবনটা মাঠের একপাশে। মাঠটা বিশাল। দোতলা স্কুল ভবন। টানা লম্বা বারান্দা। নিচতলার বারান্দায় এ মাথা থেকে ও মাথা শুধু লাশ আর লাশ। সাদা কাপড়ে ঢাকা। মুখটা বের করে রাখা।

রোদও উঠেছে বাঘের চোখের মতো। তার মধ্যেই মানুষ এই স্কুলে আসছে আপনজনের খোঁজে।

রানা প্লাজার সামনে অনেকটা জায়গা পুলিশ ঘিরে রেখেছে। তার ভেতরে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। তার বাইরে হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। তারা উদ্ধার কাজ দেখছে। তবে বেশির ভাগই এসেছে স্বজনের খোঁজে। কারো ভাইকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ বা খুঁজছে নিজের স্ত্রীকে, কেউ খুঁজছে স্বামীকে। সন্তানকে খুঁজছে কেউ। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এসেছে, যাদের আত্মীয়স্বজন কাজ করত রানা প্লাজায়।

স্বজনেরা প্রত্যেকে হাতে ধরে রেখেছে একটা করে কাগজ। তাতে নিখোঁজ মানুষটির ফটো, নাম ধাম পরিচয়। কেউ বা একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। বিধ্বস্ত ভবনের উল্টা দিকে একটা দেয়ালে সবাই নিজ নিজ নিখোঁজ স্বজনের সন্ধান চেয়ে ছবি দিয়ে নামধাম প্রকাশ করে কম্পিউটার থেকে বের করা কাগজ সেঁটে দিয়েছেন। এখনও বোধ হয় হাজার দেড়েক মানুষ নিখোঁজ। দু হাজারেরও বেশি মানুষকে জীবন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার পাওয়া মানুষদের মধ্যে আহত, মারাত্মক আহতের সংখ্যাও অনেক।

নিখোঁজ মানুষের তালিকা প্রস্তুত করছে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের ছেলেমেয়েরা। তারা সাতটা ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেছে একটা সামিয়ানার নিচে। যারা আসছেন স্বজনের ছবি নিয়ে, বিবরণ নিয়ে, তাদের কাছ থেকে শুনে ফরম পূরণ করা হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো কম্পিউটারেও এন্ট্রি দিয়ে রাখা হচ্ছে। ছবির ছবি তুলে সেটাও রাখা হচ্ছে বিবরণের সঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিকাল চারটায় একটা দেহ উদ্ধার করা হয়। তার মুখমণ্ডল ইটের নিচে চাপা পড়া ছিল। মুখটা খানিকটা থেৎলে গেছে। রক্ত তার মুখটাকে ঢেকে ফেলেছে। আর ফুলেফেঁপে চেহারাটা এমন হয়েছে যে চেনা মুশকিল। শরীরের বাকিটা প্রায় অবিকৃতই আছে। লাল রঙের টিশার্ট। জিনসের প্যান্ট। পায়ে বাটার স্যান্ডেল।

বডিটাকে উদ্ধার করে উদ্ধারকারীরা পৌঁছে দেয় অ্যাম্বুলেন্স পর্যন্ত। এই অ্যাম্বুলেন্স আসলে লাশবাহী গাড়ি। গাড়ির গায়েই সেটা লাল কালিতে লেখা আছে। এই লাশ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অধরচন্দ্র বিদ্যালয়ে।

স্কুলের মাঠে তখন বিকালের রোদ বাঁকা হয়ে পড়েছে। সবুজ মাঠটাকে হলুদ দেখা যাচ্ছে। মাঠে চোরকাঁটা, তার ওপরে ফড়িঙের ঝাঁক।

এম্বুলেন্স স্কুলের বারান্দায় পৌঁছালে রেডক্রসের ছেলেরা সেটাকে রিসিভ করে। তারা বডির পকেট হাতড়ায়। যদি কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়। একটা চাবির রিঙে দুইটা চাবি, ৩৭ টাকা এবং একটা আইডি কার্ড।

আইডি কার্ডে আছে, আবদুস সালাম, ইলেক্ট্রিক সুপারভাইজার, এসএল গার্মেন্টস, রানা প্লাজা।

এই বিবরণ নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক ছোটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের তাঁবুতে। আরেকটা বডি পাওয়া গেছে, এই তার বৃত্তান্ত।

আইডি কার্ড পাওয়া মাত্র সেটা ল্যাপটপে নথিবদ্ধ করে তরুণ স্বেচ্ছাসেবক।

দেখা যাচ্ছে, আবদুস সালাম দুইজন।

একজন আবদুস সালামের বাড়ি বারহাট্টা নেত্রকোনা। আরেকজন আবদুস সালামের বাড়ি কুমিল্লার দাউদকান্দি। দুইজনেই বিবাহিত। নেত্রকোনার আবদুস সালামের স্ত্রীর নাম নায়লা খাতুন। কুমিল্লার আবদুস সালামের স্ত্রীর নাম কাকলি বেগম।

আইডি কার্ডের ছবিটা খুব স্পষ্ট নয়। কিন্তু একেবারে অস্পষ্ট তাও বলা যাবে না।

এই বডির সঙ্গে কোনো মোবাইল ফোন ছিল না?

জি না।

স্বেচ্ছাসেবকটি প্রমাদ গোনে। তার নাম উদয়। সে থার্ড ইয়ারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাত্র। মোবাইল না থাকা মানে বিপদ। লাশ শনাক্তে সবচেয়ে কার্যকর যন্ত্র হচ্ছে মোবাইল ফোন। মোবাইল ফোনের মধ্যেই এমন কিছু নম্বর থাকে, যেগুলোর পরিচয় বাবা বা আব্বা, আম্মা, বড় ভাই। সেসব নম্বরে ফোন দিলে মৃতের আত্মীয়স্বজনকে পাওয়া যায়। আবার লাশের দাবিদার কেউ এলে তাকে বলা হয়, আপনার আত্মীয়র নম্বরে ফোন দিন। ফোন দিলে হয়তো দেখা গেল, লাশের সঙ্গে পাওয়া মোবাইল ফোনটাই বেজে উঠল। তখন আর দাবিদারকে বডি দিয়ে দিতে কোনো অসুবিধা থাকে না।

উদয় দেখেছে, এইখানে এক শ্রেণীর টাউট লোকও ভিড় করছে। অশনাক্ত বডি তারা দাবি করে। একটা বডি নিতে পারলে তার সঙ্গে এ সংগঠন ও সংগঠন থেকে টাকা পাওয়া যাবে। ডাচ-বাংলা ব্যাংক ঘোষণা করেছে, প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে তারা এক লাখ টাকা করে দেবে। বিজিএমই থেকেও নিহতের পরিবার ক্ষতিপূরণ লাভ করবে। কর্মরত শ্রমিক আহত বা নিহত হলে কারখানা কর্তৃপক্ষই ভালো অংকের টাকা দিতে বাধ্য।

মাইক্রোফোনে ঘোষণা করা হয়, এমএল গার্মেন্টসের আবদুস সালাম। তার কোনো আত্মীয় স্বজন আছেন কি?

স্যার, স্যার, একজন বৃদ্ধ এগিয়ে এসেছেন। তার সঙ্গে একজন মহিলা, বিশ বাইশ বছর হতে পারে, কোলে একটা শিশুসন্তান।

জি বলেন, উদয় ল্যাপটপের পর্দা থেকে মুখ তুলে বলে।

'আবদুস সালাম আমার ছেলে স্যার।'

'আচ্ছা। আপনার নাম কী?'

'আমার নাম আবদুল জব্বার।' বৃদ্ধের গালে সাদাকালো দাড়ি, মাথার সামনে টাক, তোবড়ানো গাল, গায়ে সাদা পাঞ্জাবি, পরনে লুঙ্গি। 'আর এইটা আমার বেটার বউ।'

'আপনার স্বামীর নাম কী?' উদয় গলা উঁচিয়ে জিগ্যাসা করে।

'জে। আবদুস সালাম।'

'আপনার নাম কী?'

'মোছাম্মৎ নায়লা খাতুন।'

'আপনাদের বাড়ি কই?'

'নেত্রকোণা। বারহাট্টা।'

আইডি কার্ড দেখিয়ে উদয় বলে, এইটা কি আপনার স্বামীর ছবি।

নায়লা খাতুন দেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী এইটা ওনার ছবি।'

'মুনে অয়।'

'মনে হয় কি। আপনার স্বামীর ছবি চিনেন না?'

'বুঝা যাইতাছে না তো ছবিটা ভালু কইরা। হ। এইটা।'

উদয় তখন সাব্বিরকে ডাকে। সাব্বির যাও তো, এদের নিয়া যাও স্কুলে। দেখো তো চিনতে পারে কিনা।

ভিড় ঠেলে নায়লা খাতুন, তার কোলে দু বছরের রিপন, আর বৃদ্ধ আবদুল জব্বার হাঁটে স্কুল অভিমুখে। তাদের সামনে সাদা রঙের টিশার্ট পরা সাব্বির।

বৃদ্ধ সাব্বিরের পেছনটা ভালো করে খেয়াল করে রাখে। ভিড়ের মধ্যে না তাকে আবার তারা হারিয়ে ফেলে।

স্কুল মাঠটা বিশাল। এক পাশে দোতলা স্কুল ভবনটা বিশাল, টানা, সমীহ জাগানোর মতো বড়। নিচতলার বারান্দায় এক সার করে অনেকগুলো বডি রাখা। সেনাবাহিনীর একজন জোয়ান এই বারান্দার দায়িত্বে।

সাব্বির আবদুল জব্বার আর নায়লা খাতুনকে বারান্দায় তুলে বলে, এই মাথা থেকে হেঁটে ওই মাথা যাবেন। আপনারা প্রত্যেকটা বড়ি দেখেন। কোনটা আপনাদের, বার করেন।

এইটাও একটা পরীক্ষা।

আবদুল জব্বার বলেন, রিপনের মা, তুমি দেইখো, আমি তো চুখে ভালু দেখি না।

রিপন কোলের মধ্যে কেঁদে ওঠে। তার বোধ হয় খিদে পেয়েছে।

নায়লা খাতুনের বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। সে চায় না, তার স্বামী মারা যাক। সে চায় না, এইখানে তার লাশ থাকুক। লাশটা পাওয়া মানেই তার সব আশা নিভে যাওয়া। এক মুহূর্তে বিধবা বনে যাওয়া।

এইভাবে নিজের স্বামীর লাশ শনাক্ত করা যায়?

এইভাবে স্বামীর মুখ খুঁজে নেওয়া যায়?

নায়লা খাতুন এক পা এক পা করে এগোয়।

আবদুল জব্বার চোখ সরু করে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে খোঁজেন তার ছেলের মুখ। বারান্দার এক মাথা থেকে হাঁটেন তারা। সার সার মৃত মানুষের মুখগুলোর মাথার প্রান্ত দিয়ে। একেকজন দেখতে একেক রকম।

AMARBOI.COM

কিন্তু সব মৃত মানুষের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার আছে। একটা মিল যেন কোথায় তাদের আছে। অনেকটা বরফ দেওয়া মাছের মতো তাদের শরীর। নীরক্ত। ফ্যাকাসে, শক্ত।

আবদুল জব্বার প্রতিটা মুখ নিরীক্ষণ করেন।

নায়লা প্রতিটা মুখ দেখে।

একটা মুখ দেখে থমকে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, এটা কী? তখন তার মনে হয়, সে কি তার স্বামীর মুখখানা আসলেই চেনে। এখন তার স্বামী জীবিত অবস্থায় তার সামনে এসে দাঁড়ালেই কি সে চিনতে পারবে? তার মনে হয়, সে তার স্বামীর মুখ ভালো করে দেখে নাই, আর স্বামীর মুখের চিহ্নগুলো, নাক, মুখ, চোখ, দাঁত সে ভালো করে নিজের মনের অ্যালবামে ধরে রাখে নাই।

আবার এগোয় নায়লা। একটা মুখ খানিকটা যেন তার স্বামীরই মতো। কিন্তু মুখখানা ফুলে ফেঁপে ওঠা। সেটা দেখে নিশ্চিতভাবে বোঝার উপায় নাই, লোকটা আদৌ তার স্বামী কিনা। তার স্বামীর পায়ে একটা কাটা দাগ ছিল। এখন এই লাশের পায়ে কাঁটা দাগ আছে কিনা, নায়লা কীভাবে জিজ্ঞাসা করে। আর তার মন বলছে, তার স্বামী বেঁচে আছে। এই লাশটাকে শনাক্ত করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কোনো মানে হয় না।

আবদুল জব্বারও ওই চেহারাটার সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। আবদুল জব্বার বলে, কাপড়টা একটু সরান না বাবা? আমি একটু শরীলডা দেখি।

সাব্বির সাদা কাপড় সরায়। লাল রঙের টি শার্ট। জিনসের প্যান্ট। হতে পারে। নাও হতে পারে।

তারা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারে না।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

কুমিল্লার দাউদকান্দির আবদুস সালামের পরিবার আসে। তার স্ত্রী কাকলি বেগম, দুই মেয়ে নার্গিস (৬) আর নাজনীন (৪) এসেছে, সঙ্গে এসেছে ছোটভাই আবদুস সোবহান। তারা বলে, আবদুস সালামের লাশ নিতে আইছি।

উদয় বলে, আপনাদের সাথে আবদুস সালামের ফটো আছে?

জি আছে। একটা গ্রুপফটো বের করে কাকলি বেগম। পেছনে নীল রঙের পর্দা, সামনে কাকলি বেগম, আর তার দুই মেয়ে, হয়তো বছর দুয়েক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে তোলা ছবি। উদয় সেই ছবির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। একটা মানুষ মানে একটা মানুষ নয়, কতগুলো সম্পর্ক। তার সঙ্গে তার পরিবার থাকে, বাবা-মা, বউ-বাচ্চা, ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব। আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা তবু স্বজন হারানোর শোক সামলাতে পারে, কিন্তু বিয়োগ বেদনা কী করে সইবে বাবা-মা। আর বাবা বা মাকে হারানোর ক্ষতি কী করে পুষিয়ে নেবে সন্তানেরা?

এই যে ছবিটা, কাকলি বেগম হাতে ধরে আছেন, তার পরনে কমলাটে খয়েরি রঙের শাড়ি, গায়ে কমলাটে হলদেটে ব্লাউজ, তার মুখমণ্ডল ভরাট, তার হাতে চুড়ি। কাকলি বেগমের ছবিতে চারজন, এখন তিনজন থাকবে, একজন হারিয়ে যাবে, কাকলি বেগমের দিনরাত্রিগুলো বইবে কেমন করে? এই বাচ্চা দুটো কি আর কোনোদিনও তাদের বাবাকে দেখবে না?

আপনারা যান স্কুলে। দেখেন আপনাদের লোকের লাশ সেখানে আছে কিনা। উদয় আবারও সাব্বিরকে দায়িত্ব দেয় কাকলি বেগমকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার।

সাব্বির বলে, চলেন।

আবদুস সালামের স্ত্রী কাকলি বেগম, ভাই আবদুস সোবহান, দুই কন্যা নার্গিস ও নাজনিন সাব্বিরের পিছে পিছে হাঁটে।

তারা অধরচন্দ্র স্কুলে যায়, মাঠ পেরিয়ে স্কুলের বারান্দায় ওঠে।

সাব্বির বলে, এই দেয়ালের পাশ দিয়া হাঁটেন। মুখ কাছ থেকে দেখেন। তারপর বলেন, কোনটা আপনাদের লোক।

আবদুস সোবহান হাঁটে। কাকলি বেগম হাঁটে। তাদের হাত ধরে বাচ্চা দুটোও হাঁটে। তারা মানুষের লাশ দেখে। বাচ্চা দুটোর মনে কী প্রতিক্রিয়া হয় কে জানে।

তারা পুরো বারান্দা হাঁটে। কোনোটাকেই তাদের স্বজন আবদুস সালাম বলে তার ঠাওর করতে পারে না।

তখন আবদুস সোবহান বলে, ওই যে মুর্দার মুখ চিনা যাইতাছে না, হেউডার কাছে ফির যাইতে হইব।

আবদুস সোবহান বলে, ভাবি, যেগুলার মুখ দেখা যাইতেছে, সেগুলার মাঝে তো নাই। যেইটা দেহা যায় না, হেইডাই হইতে পারে।

হেইডা তো দেখলাম। চিনতে তো পারি না। কেমনে কইতাম।

আবদুস সোবহান বলে, হেউডাই হইব। ভাইজান বাঁইচা থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতদিন কি আর আমগো ফুন করত না।

যদি ভিতরে আটকা পইড়া থাকে?

না আমার মুনে হয় এইডাই। তারপর সে তার ভাবির মুখের কাছে মুখ এনে বলে, হুনো ভাবি, লাশ পাইলে দুই লাখ টাকা পাইবা, দুই দুইডা মাইয়া তোমার, এগলা খাইব কী, বড় হইব কেমনে। লাশ না পাইলে কিন্তু কিছুই পাইবা না।

তাই বইলা যদি এইডা তোমার ভাইজান না হয়, তাও আমরা নিমু?

এইডা ভাইজান না মানে, এইডাই ভাইজান, চলো তোমারে দেখাই চিন আছে। আমি দেখছি।

ওরা আবার যায় সেই মুখ ফোলা শরীরটার কাছে।

আবদুস সোবহান বলে, এই দেহো, গলার নিচে সাদা ছুলি, ভাইজানের ছুলি হইছে না। তুমি কও?

কাকলি বেগম বলে, তা হইছিল। কিন্তু...

ফির কিন্তু কী? ভাইজানের পায়ের গোড়ালি ফাটা আছিল না। দেখি এইটার পায়ের গোড়ালি দেখি।

পায়ের দিককার কাপড় সরানো হয়। দেখা যায়, গোড়ালি ফাটা।

এইডাই কিনা কও। তুমি হের পা চিনো না? কেমন ওয়াইফ তুমি?

চিনুম না কেন? চিনছি, বলে ডুকরে কেঁদে ওঠে কাকলি বেগম। তার মেয়ে দুটোও তখন আব্বা আব্বা বলে কেঁদে উঠলে সাব্বিরের আর সন্দেহ থাকে না যে এই লাশ এই পরিবারেরই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাভার থানায় যেতে হয় কাকলি বেগম, আবদুস সোবহান আর মেয়ে দুটোকে। সাব্বিরই তাদের নিয়ে যায়। মৃতকে কুমিল্লার দাউদকান্দির আবদুস সালাম বলে সনাক্ত করা হয়েছে। মৃতের ভাই, স্ত্রী ও কন্যাসন্তানেরা পরিচয় নিশ্চিত করেছে। মৃতের আইডি কার্ডও পাওয়া গেছে। কাজেই কোনোই সন্দেহ নাই এই লাশ এই পরিবারেরই প্রাপ্য। পুলিশ সদস্য একটা কাগজে কাকলি বেগমকে সই করতে বলেন। সাক্ষী হিসাবে আবদুস সোবহান আর সাব্বিরও সই করে।

তাদের পুরা ঠিকানা, মোবাইল নম্বরও ঠিকমতো নেওয়া হয়।

পুলিশ সদস্য বলে, যান, এই কাগজটা নিয়া যান। এইটা দেখাইলে আপনাগো লাশ নিতে দিব।

আবদুস সোবহান বলে, লাশ নিমু কেমনে। আমগো কাছে তো কোনো টাকাপয়সা নাই।

সাব্বির বলে, আপনারা আসেন। আমি ব্যবস্থা করছি।

অধরচন্দ্র স্কুলেই জেলা পরিষদের ক্যাম্প আছে। সেইখানে লাশপ্রতি কুড়ি হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে গাড়ি-খরচ দাফন-কাফনের খরচ বাবদ। সাব্বির তাদের নিয়ে যায় সেই ক্যাম্পে। পুলিশের কাগজ দেখায় তারা।

সেখানে তাদেরকে কুড়ি হাজার টাকা বুঝিয়া পাইলাম আর লাশ বুঝিয়া পাইলাম মর্মে স্বাক্ষর দিতে হয়।

আপনি কে হন মুর্দার?

ছোট ভাই, আবদুস সোবহান বলে।

আপনি কে হন?

উনি মুর্দার ওয়াইফ, আবদুস সোবহানই জবাব দেয়।

তাইলে টাকা আমি ওয়াইফের হাতে দিলাম। জেলা পরিষদের একাউন্টেন্ট চটের ব্যাগ থেকে টাকা বের করে গুনে তুলে দেন কাকলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেগমের হাতে। বলেন, গইনা লন।

কাকলি টাকা গোনে। বিশ হাজার টাকা এক সঙ্গে সে জীবনে প্রথম গুনল।

লাশবাহী গাড়ি পাওয়া যায় ভাড়ায়।

লাশ তোলা হচ্ছে কফিনে।

এই গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দার কাছে।

এই সময় সন্তানকোলে নায়লা খাতুন আর আবদুল জব্বার দৌড়ে আসে সেখানে। এইটা আমগো লাশ। এইটা এই রিপনের বাপ। ও স্যার, এইটা আমার স্বামীর লাশ।

কাকলি বেগম রোষায়িত কণ্ঠে বলে, কইলেই হইল। এইটা আমার সোয়ামির লাশ।

পুলিশ বাঁশি বাজায়। লাশ গাড়িতে ওঠে। কাকলি বেগম, আবদুস সোবহান, নাজনীন, নার্গিস সেই গাড়িতে উঠে কাঁদতে কাঁদতে দাউদকান্দির দিকে যাত্রা করে।

কাকলি বেগম কফিনটা ধরে রাখে। মাঝখানে কফিন। দুই পাশে তারা বসেছে।

কাকলি বেগমের বুকটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে যায়। একটা মানুষ ছিল এতদিন, এখন নাই। আর কোনোদিনও আসবে না?

সে রিপনকে জড়িয়ে ধরে।

গাড়িটা চলে যায় ধুলা উড়িয়ে। নায়লা খাতুনের মনে হয়, তার সর্বস্ব চলে গেল। গাড়ি চলে গেলে জায়গাটা শূন্য হয়ে যায়। নায়লা খাতুনের কেমন যেন লাগছে, মনে হচ্ছে, তার অস্তিত্বই বুঝি শূন্যে মিলিয়ে যাবে।

তখন তাকে সান্ত্বনা দেয় আবদুল জব্বার। বলে, মারে, লাশ না পাইলাম, কিন্তু আশা তো থাকল। হয়তো সে বাঁইচা আছে। হয়তো সে ভিতরে আটকা আছে। হয়তো সে কুনু হসপিটালে আছে। এমনও তো হইতে পারে, সে এইদিন কাজে যায় নাই। কুনুহানে বেড়াইতে গেছে গা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোছাব্বের হোসেন, সাভার থেকে । প্রথম আলো ডট কম । তারিখ: ৩০-০৪-২০১৩

রানা প্লাজা ধসে পড়ার পরের দিন উদ্ধার করা হয় পাখি বেগমকে। উদ্ধারের সময় তাঁর দুটি পা-ই কেটে ফেলতে হয়। বর্তমানে তিনি সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুই পা হারিয়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়া পাখি বেগম তেমন কোনো কথাই বলছেন না; শুধুই কাঁদছেন। অত্যন্ত ক্ষীণ স্বরে আকুতি জানিয়ে তিনি বললেন, 'আমার পা ফিরাই দেন...পা ফিরাই দেন।'

পাখির ছোট ভাই আসিফ জানান, রানা প্লাজার ষষ্ঠ তলায় মেশিন অপারেটরের কাজ করতেন পাখি। তাঁর স্বামী জাহাঙ্গীর অন্য একটি পোশাক কারখানায় চাকরি করেন। দুই মেয়ে তাঁদের। বড় মেয়ে ইয়াসমিনের বয়স নয় আর ছোট মেয়ে আদরীর বয়স সাত বছর। নিজে উপার্জন করে অভাবের সংসারের বোঝা কমানোর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন যে পাখি বেগম, এখন দুই পা হারিয়ে তাঁকেই অন্য সবার কাছে বোঝা হয়ে থাকতে হবে বাকি জীবনটা।

একই হাসপাতালের বিছানায় কাতরাতে দেখা গেল হবিগঞ্জের আরতি রানী দাশকে। ডান পা কেটে তাঁকে বের করে এনেছেন উদ্ধারকর্মীরা। ধসে পড়া ভবনটির সপ্তম তলায় কাজ করতেন তিনি। চার বোনের মধ্যে সবার বড় আরতি। চাকরি করে তিনি টাকা পাঠাতেন গ্রামে। তা দিয়েই চলত অন্য বোনদের পড়ালেখা।

কাতরাতে কাতরাতে আরতি বললেন, 'এক পা লইয়্যা ক্যামনে কাজ করমু? হের থাইক্যা মইরা যাওন ভালা ছিল।' ষষ্ঠ তলায় কাজ করত ১৬ বছরের কিশোরী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আন্না। তার ডান হাত চাপা পড়ে। এক দিন পর উদ্ধারকর্মীরা চাপা পড়া হাত কেটে তাকে উদ্ধার করেন। এখন তার ঠাঁই হয়েছে এনাম মেডিকেলের বিছানায়। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে আন্না সবার বড়। কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে বলে, 'আমার তো ডাইন হাতটাই গেল গা, অখন আমি সারাটা জীবন ক্যামনে চলব? আমারে কেডা কাজ দিব?' আন্নাদের এই প্রশ্নের উত্তর এখন কে দেবে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালতিরানি বেরিয়ে এসেছিল প্রথম দিনেই, সকালবেলা। বিশাল শব্দ হলো, মনে হচ্ছে মহাপ্রলয়, পায়ের নিচে ছাদ ডেবে যাচ্ছে, তারপর পুরো ছাদটা সহ তারা নেমে যাচ্ছে নিচে, সম্মিলিত চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে কিছু বোঝার আগেই সে নিজেকে দেখতে পায় একটা জায়গায়, তার মাথার ওপরে আরেকটা ছাদ, ততক্ষণে সে পড়ে গেছে মাটিতে, আর তার পাশে ভাঙা কাচের টুকরা আর অন্যসব প্রলয়চূর্ণ। কিন্তু তার পাশেই সে একটা খোলা জায়গা দেখতে পায়, যা দিয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে। তার আশেপাশে মানুষের শরীর, শোয়া, বসা, রক্তাক্ত, অক্ষত সেসব ডিঙিয়ে সে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে এসে পড়ে ওই খোলা জায়গাটায়, মাথা বের করে। এবং দেখতে পায় বাইরের পৃথিবী। উদ্ধারকারীরা দেখতে পায় তাকে। কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে তাকে ধরে কাপড়ের তৈরি স্লাইডে ছেড়ে দেওয়া হলে সে সাঁই করে নিচে নেমে আসে, সেখানে কয়েকজন লোক তাকে ধরে মাটিতে নামায়। সে নিজের পায়ে দাঁড়ায় সজ্ঞানে, এবং হেঁটে যেতে থাকে। খানিক পরে তার হুঁশ হয়, সে তাকায় পেছন দিকে, এবং দেখতে পায়, আটতলা ভবন এতটুকুন হয়ে গেছে। তখন সে হায় ভগবান বলে কেঁদে মাটিতে বসে পড়ে।

মালতিরানিকে তখন জনতা ঘিরে ধরে ও খাওয়ার জল দেয়।

মালতিরানি কী করবে বুঝতে পারে না। তার উচিত এখন কৃষ্ণাকে খোঁজা। কৃষ্ণা আর সে একই ঘরে থাকে। তারা অন্য দিনের মতো এক সাথেই বেরিয়েছিল ঘর থেকে। ঝিনাইদহর চৌগাছি থেকে তারা দুজনে একই সঙ্গে এসেছিল সাভারে, চাকরির খোঁজে। তাদেরকে আবার এনেছিল তাদের গ্রামে শুক্লারানি বৌদি। কাজ পেয়ে গেলে তারা আলাদা বাসাভাড়া নিয়েছে। বৌদির সঙ্গে এখন যোগাযোগ কম।

মালতিরানি উঠে দাঁড়ায় এবং বলে, আমি ঘরে যাব।

মালতিরানি ঘরের পথে হাঁটে। তখন তার মনে হয়, তারা একসঙ্গে অনেকেই আজ কারখানায় এসেছিল কাজ করতে। হাসনাবু ছিল, নাসিমা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষ্ণা, ববিতা, জুঁই, রাশেদা, ফুলবানু... কে কেমন আছে? সে ভাবে সে কৃষ্ণাকে মোবাইলে কল দেবে। তখন তার মনে হয়, তার হাতে মোবাইল ফোন নাই। মোবাইল ফোন তো তার সামনের টেবিলের নিচের খাপে রেখেছিল। যখন তাদের ভবনটা ভেঙে যায়, তখন সেটা নিতে তার খেয়াল ছিল না। এখন সে কি আবার ফিরে যাবে তার মোবাইলের খোঁজে। পুরোনো অভ্যাসবশত সে একবার ঘুরে যাবার জন্য উদ্যত হয় এবং পরক্ষণেই তার মনে হয়, তাদের ভবনটা আর নাই। সে হাঁটতে হাঁটতে নিজের ঘরে আসে। চাবিটা তার কোমরের সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেটা খুলে নিয়ে দরজা খোলে।

পরের দিন সকালে যশোর থেকে মা আসে, বাবা আসে, কৃষ্ণার বাবা এবং মামা আসে। মা বলে, তোর কোনো খবর না পেয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছি, তাই চইলে এসেছি নাইটকোচে। তুই বেঁচে আছিস।

মা কৃষ্ণাকে জড়িয়ে ধরে। তার চোখের জলে কৃষ্ণার জামা ভিজে যায়।

কৃষ্ণার বাবা হরিহরণ কাকু বলে, মা, তোমাদের ফোন বন্ধ, দুশ্চিন্তায় চলে এলাম। আমার কৃষ্ণা কোথা? তারে যে দেখিনে।

কতি পারিনে কাকু। আমি যে কেমন কইরে কেমন কইরে বেরিয়ে এলাম, সে তো ভগবান জানে, আমি নিজেও কতি পারিনে। কৃষ্ণার জন্যি পথ চেয়ে বইসে আছি, সে তো এলো না।

এবার কাকু কাঁদতে থাকে, কৃষ্ণারে তুই কোথা মা? চলো তো ফ্যাক্টরিতে যাই। কৃষ্ণার বাবা আর মামাকে সঙ্গে নিয়ে মালতি বিধ্বস্ত ভবনের সামনে জনতার ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়ায়।

তখন তার মনে হতে থাকে, ভবনটা যখন ভেঙে পড়ে, আর যখন সে নিজেকে আবিষ্কার করে মেঝেতে শোয়া অবস্থায়, তখন সে কৃষ্ণার শরীরের ওপর দিয়েই হামাগুড়ি দিয়ে এসেছিল, তখন কৃষ্ণা বেঁচে আছে কিংবা মারা গেছে, এই কথা খেয়াল করার সময় তার হয় নাই। এটা সে কী করেছে, সে নিজেকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, কৃষ্ণাকে বাঁচানোর কথা তার একবারও মনে পড়ল না?

ওই ফ্লোরে যারা ছিল, তাদের অনেকেই হয়তো বেঁচে গেছে। নিজের অবস্থার কথা ভেবে মালতি সান্ত্বনা খোঁজে। সে তখন ওই ভিড়ের মধ্যেই হরিহরণ কাকুকে বলে, কাকু, চলেন, আমরা হাসপাতালে যাই, আমার মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, কৃষ্ণা বাঁইচে আছে।

তারা প্রথমেই এনাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যায়। সেখানে গিয়ে তারা রোগীর নামের তালিকা দেখে। আগাগোড়া দেখেও তারা কৃষ্ণার নাম পায় না। তখন তারা অজ্ঞাতপরিচয় রোগীদের দেখতে চায়। ভিড়ের মধ্যে একজন তরুণ সাদা এপ্রনপরা চশমাওয়ালা ডাক্তারকে সে টার্গেট করে এবং তাকে গিয়ে ধরে, স্যার, আমার দিদি স্যার আমার সাথেই ছিল স্যার গার্মেনটসে, আমি স্যার বের হয়ে এসেছি, আমার দিদি কি স্যার এই হাসপাতালে আছে?

তরুণটি বলে, পেসেন্টের নামের লিস্ট তো ওখানে টাঙানো আছে।

ওই লিস্টিতে নেই স্যার।

তাহলে আমার সাথে আসেন।

তারা তিনজন, মালতি, হরিহরণ আর নগেন (কৃষ্ণার মামা) সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় যায়। সেখানে মেঝেতেও হাতপা ভাঙা রোগী। একটা জায়গায় সব অচেতন রোগী। তাদের ঠাঁই হয়েছে বিছানায়।

মালতি, হরিহরণ, নগেন প্রত্যেকটা রোগীর মুখ ভালো করে খেয়াল করতে থাকে।

ওই তো আমার কৃষ্ণা, হরিহরণই প্রথম দেখতে পায় তার মেয়েকে।

কৃষ্ণা তখনও অচেতন।

ডাক্তারকে মালতি বলে, স্যার এই যে আমার দিদি স্যার।

ডাক্তার রোগীর হিস্ট্রি দেখে। বলে, এখনও ডেঞ্জার পিরিয়ড পার হয়নি। কালকের দিনটা যদি সারভাইভ করে তো বেঁচেই গেল। এমনিতে হাঁটুতে আঘাত ছাড়া আর কোনো ইনজুরি নাই। মনে হয়, শক থেকে সেন্সলেস হয়েছে। সেরে যাবে।

হরিহরণ তখনি চৌগাছি গ্রামে কৃষ্ণার মাকে মোবাইলে খবরটা দেয়। মেয়ে ভালো আছে, বেঁচে আছে।

মেয়েকে দাও দিকিনি। কৃষ্ণার মা বলে।

দিবানে। এখন ডাক্তার ওকে কথা কতি মানা করছে। কথা বলা যাবি না নে।

পরের দিন সকালবেলা কৃষ্ণার জ্ঞান হয়। সে বলে, আমি কোথা?

বাবা তার শিয়রে দাঁড়িয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ভগবানের কৃপায় তুই বেঁচে আছিস মা, ভালো আছিস।

AMARBOI.COM

সকাল সাতটার সময় তার বাড়ির দরজায় কড়া নড়ে ওঠে। বিজলি জেগেই ছিল।

বিজলি তার বিশাল পেটটা নিয়ে নড়াচড়া করতে পারে না। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সে অতিকষ্টে বিছানা ছাড়ে। নজিবর এল না। সারারাত বিজলি ছটফট করেছে। স্বপ্ন দেখেছে এই বুঝি নজিবর এল। ঘুম ভেঙে গেছে! আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার ঘুম ভেঙে গেছে। তন্দ্রামতো এসেছে। স্বপ্ন দেখেছে বিজলি। নানা ধরনে অর্থহীন স্বপ্ন। তারপর আবার ঘুম ভেঙে গেছে। তার মনে হয়েছে, তার ছেলে হলে নাম রাখা হবে সাকিব। মেয়ে হলে মৌসুমী। কিন্তু নজিবর আসে না কেন? দাউদ ভাইয়ের মোবাইল থেকে ফোন এসেছে, মাঝ রাতে, ভাবি, আমি তো এটে কোনো ব্যস্ত। আপনি বাচ্চা দুইটারে দেখিয়া থোন। আমি আরেক না কাম করিয়া সেন আসিম।

ভাই, আপনার বেটাবেটি ভালা আছে। আপনে আসেন। চিন্তা না করিয়া আসিয়া পড়েন। কিন্তুক ভাইজান, আপনের ভাই যে আসিল না। এলা মুই কোটে যাওঁ কাক কি পুছ করোম?

দাউদ ভাই মেলা রাতে ঘরে ফেরে। তখন উদ্ধার কাজে আরেক দল লোক যোগ দিয়েছে। দমকলের, সেনাবাহিনীর, পুলিশের, আনসারের শিফট বদল ঘটেছে। যাবার সময় তারা তাকে জোর করে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে। সেও ঘোরগ্রস্তের মতো চলে এসেছে বাড়িতে। ছেলে দুটা আছে। তার তো দায়িত্বজ্ঞানহীন হলে চলে না।

এসে নিজের ঘরে উঁকি দেওয়ার পরে সে চলে এসেছিল বিজলির কাছে। ভাবি ভাবি নিন্দ গেছেন নাকি বাহে?

তখন অনেক রাত। বাইরে গলার আওয়াজ শুনে বিজলি চমকে উঠেছিল। তাহলে কি নজিবর এল?

না, নজিবর নয়। দরজা খুলে দাউদকে দেখতে পায় বিজলি। ঘরের আলো তার চোখে মুখে পড়েছে, তাকে দেখাচ্ছে ঝড়ে ভেজা কাকের মতো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুলায় ধূসরিত, বিধ্বস্ত। ভাই, আপনের ভাইয়ের কোনো খবর পাইলেন।

না ভাবি পাও নাই তো।

তখন বিজলির মনে হয়, হাসনাবুও তো আসে নাই। সে জিজ্ঞেস করে, হাসনাবুর কোনো খবর পাওয়া গেইছে?

না বুবু। পাওয়া যায় নাই।

তারপর দুজনে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। এর পর দুজন দুজনকে কী বলবে? বিজলির স্বামী আসে নাই। দাউদের বউ আসে নাই। তারা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর দাউদ কাঁদতে আরম্ভ করে। হু হু করে কান্না।

ঝিঁঝিঁ ডাকছে। দূরে শোনা যাচ্ছে কুকুরের ডাক। সেই ডাক ছাপিয়ে শোনা যায় পুরুষ মানুষের অসহায় কান্নার আওয়াজ।

না কান্দেন বাহে। বলে বিজলি। আল্লাহকে ডাকেন। বলে নিজেই কাঁদতে শুরু করে দেয় সে।

দরজা খোলে বিজলি। দরজায় মা আর হিরু দাঁড়িয়ে। মা বলে, জামাইয়ের কোনো খবর পাওয়া গেইছে?

না মা। যায় নাই। আসো... শুনে বিজলির মা অজ্ঞান হয়ে যায়। হিরু বলে, কী মুশকিল, হামরা আসছি মানুষক হেল্প করার লাগিয়া, এখন এই মায়ামানুষ কেমন নিজেই সমস্যা হয়া যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্ত বলে, মা কই বাবা? মা আর আইব না?

দাউদ বলে, আল্লাহক ডাকেন বাবা। যদিল আল্লাহ বাঁচায় তো আসিবে।

শাহিন বলে, মা কোটে? মুই মার কোলত যাইম।

দাউদ বলে, আসিবে বাপ। মাও আসিবে।

নাসরিন বলে, খালু, মোক একখান মোবাইল ফোন দিয়া যান না কেনে? মুই সারাদিন একলা একলা থাকোম।

নাসরিনের একা থাকার কষ্ট দূর হয়। নাসরিনের নানি চলে আসে মিঠাপুকুর থেকে।

মা এসে তার হারিয়ে যাওয়া সন্তানের জন্য কাঁদে। নাতি দুটোকে জড়িয়ে ধরে, আর বিনবিন করে মিহি সুরে কাঁদে, ও মোর হাসনা রে, তুই কোটে গেলু রে, তুই ফিরি আয় রে, ও আল্লা রে আমার মাইয়াটাক ফিরিয়া দেও রে।

AMARBOI.COM

হিরু আর নাসরিন বিধ্বস্ত রানা প্লাজার সামনে যায়। ভিড়ের মধ্যে দুজনের হারিয়ে যাবার জোগাড়। নাসরিন বলে, হিরুমামা, মুই তো হারায়া যাইম। তোমার আঙুল ধরি থাকি, দেন।

হাজার হাজার মানুষ। নাসরিন মানুষ দেখে তাজ্জব বনে যায়। এত মানুষ। এত ভিড়। এত মানুষ কোত্থেকে এল।

হিরু নাসরিনের হাত ধরে থাকে। মেয়েটা তাকে মামা বলে ডাকে। তবু তার ভালো লাগে।

হিরু বলে, চল তো ওই দিকটাত যাই। ওটেকোনা দেখা যাইতোছে মানষে দেয়ালত কী সব টাঙাইতোছে।

নাসরিন বলে, চলেন। মোক ধরি নিয়া যান। মুই যদিল হারেয়া যাও মোক কলে আর আর খুঁজি না পাইবেন। তখন কিন্তুক শান্ত শাহিনক দেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ থাকিবে না। ওদের নানির কিন্তুক শরীল খারাপ। মুই ছাড়া অমাক ভাত ক্যাঁয় পাক করি খিলাইবে?

ওরা ভিড় ঠেলে এগোয়। খুব রোদ। তবে আকাশে মেঘও আছে। গরম তাই বেশিই লাগে।

দেয়ালের কাছে গিয়ে ওদের চোখ ছলছল করে। সন্ধান চাই। সুন্দর রঙিন ফটো। তারপর নিচে হারিয়ে যাওয়া মানুষটার নাম ধাম পরিচয়। শেষে যোগাযোগের ঠিকানা।

সেইসব ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে হিরুমিয়া। একেকজনের একেক রকম চেহারা। কেউ বা নারী, কেউ বা পুরুষ। কেউ চোখ কুঁচকে তাকিয়ে আছে, কেউ বা তাকিয়ে আছে ড্যাবডেবে চোখে। কিন্তু প্রত্যেকে মানুষ। এতগুলো মানুষ হারিয়ে গেছে। তার দুলাভাইকে সে খুঁজে ফিরছে। নাসরিন খুঁজছে তার বোনকে। তেমনি কতজন তাদের স্বজনকে খুঁজছে।

হিরুমিয়া ভাবে, তাদেরও উচিত এই রকম করে কম্পিউটারে প্রিন্ট আউট নিয়ে পোস্টার তৈরি করা। তারপর এই দেয়ালে লাগানো।

নাসরিন, হিরু ডাকে।

জি মামা।

তোমার বাড়িত কি খালার কোনো ফটোক হইবে?

আছে তো একখান।

চল তাইলে বাড়িত যাই। দুলাভাইয়ের ছবি আছে কিনা খুঁজি। তোমরাও খোঁজেন হাসনাবুর ছবি আছে নাকি নাই। তার ছবি দিয়া হামরাও এই রকম কাগজ বাইর করমো। সন্ধান চাই।

চলেন।

তারা তাদের বস্তিতে ফিরে আসে।

বিজলিকে হিরু বলে, একখান ফটোক দেন তো মোক। দুলাভাইয়ের ফটোক। পোস্টার বানান খায়।

বিজলিও একটা ছবি বের করে দিতে পারে, যেটাতে বিজলি আর নজিবর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সেই ছবিটা নিয়ে হিরু যায় হাসনাবুর ঘরে। নাসরিন হাসনাবুর একটা ফটো বের করতে পারে। যেখানে এক ছবিতে হাসনাবু, দাউদ ভাই, শান্ত আর শাহিনকে দেখা যায়। সে এই ফটোটাও নেয়। তারপর বেরিয়ে পড়ে সাভারের কম্পিউটারের প্রিন্ট নেওয়া হয় ধরনের দোকানে। ছবিগুলো স্ক্যান করে পোস্টার বানানোর কাজে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম্পিউটার অপারেটর সিদ্ধহস্ত। এ পর্যন্ত একশ'টা পোস্টার সে নিজে বানিয়েছে। দুইটা পোস্টার একশ টাকা। অপারেটর বলে। হিরু মিয়া তার প্যান্টের পকেটে থাকা মানিব্যাগ বের করে একশ টাকা দিয়ে দেয়।

হিরু মিয়া বলে, ইনকাম তাইলে তো আপনার ভালই হইতোছে, কী কন ভাইজান।

কম্পিউটার অপারেটর কম্পিউটারের পর্দা থেকে চোখ না তুলে বলে, জি আপনাদের দোয়া।

হিরু মিয়া বলে, কয়টা পোস্টার বানাইলেন এই পর্যন্ত।

একশ টা তো হইবই?

তাইলে তো ৫০০০ টাকা আপনের ইনকাম হইল।

জে হইল।

আরও হইবে মনে হয়?

হ। হইবে। দেড় হাজার দুই হাজার মানুষ নাই। আরও পোস্টারের কাজ আইতে পারে। কিন্তুক সবাই তো আর আমার কাছে আহে না। অন্য দোকানেও যাইতে পারে। তাই না?

জে। তা পারে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাভারে ভবনধ্বসঃ যন্ত্রপাতি নেই আছে কেবল মনের জোর মানুষের জন্যই মানুষ

শরিফুল হাসান । তারিখঃ ২৭-০৪-২০১৩ । দৈনিক প্রথম আলো ।

বুধবার রাত তিনটা । রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপে কান পেতে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী আবু ইউসুফ শুনতে পান বাঁচার জন্য মানুষের আকুতি । দেরি না করে বিমটি ভাঙা শুরু করেন তিনি । এরপর দেখেন, ভেতরে বেশ কয়েকটি লাশ । আর সেই লাশের ওপর জীবিত কয়েকজন মানুষ । তাঁরা গোঙাচ্ছেন, কেউ 'পানি পানি' বলে চিৎকার করছেন ।

রানা প্লাজার সামনে দাঁড়িয়ে গতকাল শুক্রবার আবু ইউসুফ বললেন, 'স্ল্যাব ভেঙে ইট-পাথর সরালেও রড থাকার কারণে কাউকে বের করতে পারছিলাম না । রড কাটলে বিমটি ভেঙে পড়তে পারে । সবাই তখন মারা যেতে পারি । কিন্তু মানুষের আকুতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কয়েকটি রড কেটে ছোট জায়গা তৈরি করলাম । এরপর একে একে ১৫ জনকে জীবিত আর কয়েকটি লাশ বের করে আনি ।'

টঙ্গী কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথম বর্ষের ছাত্র মিজানুর রহমান বছর খানেক আগে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে উদ্ধার কাজের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন । সাভারের দুর্ঘটনার খবর শুনেই তিনি এখানে ছুটে এসেছেন । গত তিন দিনে তিনি অন্যদের সঙ্গে ধ্বংসস্তূপ থেকে অন্তত ২০ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছেন । আর লাশ উদ্ধার করেছেন শতাধিক ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'তিন দিন ধরে আমি এখানে আছি। আমার খুব কাছেই একজন মানুষ বাঁচতে চাচ্ছে। কাকুতি-মিনতি করছে, তাকে যেন বাঁচাই। কিন্তু আমি কিছুই করতে পারছি না। কারণ তার পায়ের ওপরে বিম পড়ে আছে। সেই মুহূর্তে নিজেকে মনে হচ্ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষ। আর যখন কাউকে বাঁচাতে পারছিলাম, তখন আনন্দে কান্না পাচ্ছিল।'

গাজীপুর থেকে উদ্ধারকাজে ছুটে এসেছেন উজ্জ্বল নামের একজন। রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। ধ্বংসস্তূপের যেখানেই একটু ফাঁক দেখছেন, সেদিক দিয়ে ঢুকে আটকে পড়া লোকজনকে উদ্ধার করছেন তিনি। এভাবে কাজ করতে গিয়ে নিজে আহত হয়েছেন, তাঁর পা কেটে গেছে। কিন্তু ক্লান্তি নেই উজ্জ্বলের। তিনি বলছিলেন, 'মানুষের জন্যই মানুষ। এক দিন কাজ না করলে আমার সংসার চলে না। তার পরও আমি এখানে এসেছি। মানুষের জন্য কাজ করে শান্তি লাগছে।'

আবু ইউসুফের মতোই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে একের পর এক জীবিত মানুষকে উদ্ধার করে আনছেন ফায়ার সার্ভিসের ২০০ কর্মী। তাঁদের সঙ্গে আছেন মিজানুরের মতো প্রশিক্ষিত ২৭৫ জন স্বেচ্ছাসেবী। আর বাকিরা উজ্জ্বলের মতো সাধারণ মানুষ। তাঁদের কাছে আধুনিক যন্ত্রপাতি নেই, কিন্তু কেবল মনের তীব্র ইচ্ছায় তাঁরা উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত বুধবার সকাল নয়টার দিকে রানা প্লাজা ধসে পড়ে। তখন থেকেই সাধারণ মানুষ উদ্ধার তৎপরতা শুরু করে। এরপর ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব-পুলিশসহ অন্যান্য সংস্থার লোকজন উদ্ধারকাজে অংশ নিতে সাভারে আসেন। তবে অনেকেরই অভিযোগ, উদ্ধারকাজে কোনো সমন্বয় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাস্থলে উপস্থিত একজন সরকারি কর্মকর্তা বলেছেন, যেকোনো দুর্যোগ হলেই আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটি হবে। এরপর সবাই মিলে কাজ করবেন। কিন্তু সাভারে কীভাবে কী হচ্ছে, সেটা অনেকেই জানেন না।

স্বজনদের খোঁজে ঘটনাস্থলে উপস্থিত আবুল কাশেম, সামাদ আলী, রবিউল ইসলামসহ অনেকেরই অভিযোগ, সাধারণ মানুষ আর ফায়ার সার্ভিস ছাড়া বাকি সবাই কেবল দেখছে। এ ছাড়া উদ্ধারকাজের দীর্ঘসূত্রিতা নিয়েও ক্ষুব্ধ অনেক মানুষ।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত অনেকের অভিযোগ, সাধারণ মানুষই ভবনের বিভিন্ন তলায় গিয়ে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন। উদ্ধারকাজে ভারী যন্ত্রের ব্যবহার নেই বললেই চলে। পেশাদার বাহিনীর সদস্যরা যদি সক্রিয়ভাবে অংশ নিতেন, ভেতরে যেতেন, তাহলে আরও অনেক মানুষ বাঁচতে পারত।

তবে উদ্ধারকর্মীরা বলছেন, নয়তলা ওই ভবনটি ধসে এখন তিনতলার উচ্চতা নিয়ে আছে। একটি তলার সঙ্গে একটি তলা মিশে গেছে। ফলে ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছোট ছোট সুড়ঙ্গ করে তাঁরা জীবিতদের বের করে আনার চেষ্টা করছেন। কাজটি অনেক কঠিন।

উদ্ধারকাজে বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সম্পর্কে জানতে চাইলে ফায়ার সার্ভিসের পরিচালক জিহাদ উল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, 'একটি উদ্ধারকাজে একেকজনের একেক রকম দায়িত্ব থাকে। সবাই মিলেই কাজটি করতে হয়।' তিনি বলেন, 'এ মুহূর্তে ভবনের ভেতরে প্রতিটি ফ্লোরে ঢুকে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা জীবিত ও লাশ বের করে আনছেন। তাঁদের সঙ্গে প্রশিক্ষিত অনেক স্বেচ্ছাসেবী রয়েছেন। বাইরের কিছু সাধারণ মানুষও আমাদের সঙ্গে আছেন। আমরা গর্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে করে জীবিত মানুষকে বের করে আনছি। কাজটি অনেক কঠিন। চাইলেও এই মুহূর্তে বুলডোজার দিয়ে ভবনে ঢুকে সবকিছু সরিয়ে নেওয়া যাবে না। কারণ, ভেতরে এখনো অনেক জীবিত মানুষ আছে। সবাইকে ধৈর্য ধরতে হবে।'

স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উদ্ধারকাজ পরিচালনার জন্য মেয়র হানিফ ফ্লাইওভার থেকে ১৬০ টন হাইড্রোলিক টেলিস্কোপ ক্রেন, ১০০ টন ট্রেলার, ২৫ টন ক্রেন ও আরও কিছু ভারী যন্ত্রপাতি গতকাল বিকেলে সাভারের ধ্বংসস্তূপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শান্ত আর পারে না। তাদের মা কি সত্যি সত্যি হারিয়ে গেল। আর কোনোদিনও আসবে না। এক দুপুরবেলা, যখন চিল ডাকছে তাদের বসতিঘরের পেছনের বড় বাড়িটার ছাদে, যখন বস্তিতে কোনো পুরুষ মানুষ নাই, নারীরাও কাজে গেছে, বাচ্চারা স্কুলে, তখন শান্তর ভারি মন খারাপ হয়। তাদের মা-টা কি মরেই গেল?

শাহিন তো কিছুই বোঝে না। সে মাঝে মধ্যে বলে, ভাইজান, মা কখন ফিরি আসবে?

তা তো কইতে পারি না ভাই।

বাবাও ক্যান জানি ঘরত থাকিবার চায় না। কখন যে বাইর হয়া যায় কখন যে ফিরে দেখায় হয় না। নানি আসছে বলিয়া কি বাবা ঘরত থাকিবার চায় না?

ভাইজান। মোক মাকে আনি দেও।

কোথাইকা আইনা দিমুং

যেটে থাকি পারেন আনি দিবেন।

হঠাৎই শাহিন কাঁদতে শুরু করে।

তারা বসে আছে তাদের ঘরের বাইরে। শান্ত বলে, চল, চাকা চাকা খেলি। শান্ত একটা পুরোনো টায়ার জোগাড় করেছে। সেটা দিয়ে সে চাকা চাকা খেলতে শুরু করলে শাহিন তার দুঃখ ভুলে যায়। তারা দৌড়াতে থাকে একটা চাকার পেছনে।

ফিরে আসে খিদে-পেটে। ঘরে ঢোকে।

নানি নানি ভোক নাগছে। ভাত দেও। শাহিন চিৎকার করে।

নানি একটা থালায় ভাত বাড়ে। দুজনকে খাওয়াতে থাকে। এই সময় হিরু মিয়া আসে। তার হাতে একটা এ-ফোর সাইজের কাগজ। সন্ধান দিন। নাম: হাসনা বেগম। স্বামীর নাম: মো: দাউদ মিয়া। রানা প্লাজা থেকে নিখোঁজ। সন্ধানপ্রার্থী: দাউদ মিয়া...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানি সেই ছবি দেখে কাঁদতে শুরু করে।

নাসরিন বলে, নানি, কান্দেন না তো। তোমরা কান্দিলে হামরা কী করমো।

নানি বলে, না মা বইন, মুই তো কান্দোম না।

তখন শাহিন ও শান্তও কান্না জুড়ে দেয়।

নাসরিনও চোখের পানি আটকাকে পারে না।

হিরু মিয়া দেখে, ভালো বিপদ। তার এখন কান্না পাচ্ছে না। সে বলে, মুই যাও। মোর কাম আছে। সে বিজলির ঘরে যায়।

বিজলি বিছানায় বসে আছে। হিরু মিয়ার মা চুলায় রান্না চড়িয়ে দিয়েছে। মা বোধ হয় মাছ রান্না করছে। মাছের ঝোলের তেল-নুন-হলুদ মাখা গন্ধ ঘরটা ম ম।

হিরু ঘরে ঢোকে। তার হাতে আরেকটা কাগজ। এটাতে লেখা: সন্ধান চাই। নিচে নজিবরের ছবি।

বিজলি সেই কাগজটার দিকে তাকিয়ে থাকে। হাত বাড়িয়ে কাগজটা নেয়। তারপরও চুপ করে থাকে। বিজলি কাঁদে না। বিজলি কথা বলে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাউদের নাকে মুখে একটা গামছা বাঁধা। মাথায় একটা হেলমেট। উদ্ধারকাজ করে চলেছে সে প্রথম দিন থেকেই। এখন উদ্ধারকারীদের বন্ধু হয়ে গেছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে লাশ উদ্ধার করা, জীবিত কাউকে পেলে তাকে ধরে আনা, এই সব কাজের একজন নিয়মিত কর্মী। দেয়াল ফুটো করার কাজে সবচেয়ে দক্ষ রাজমিস্ত্রি জয়নাল। সে নির্মাণ শ্রমিক। এর আগে বহু ভবন ভাঙার কাজে সে অংশ নিয়েছে। ২৪/২৫ বছরের এই যুবকের পেটানো শরীর। তার মাথায় ঝাঁকড়া চুল। ওয়েল্ডিং মিস্ত্রি গণেশ খুব দক্ষতার সঙ্গে লোহার রড কেটে দিতে পারে। আর আছে দাউদের মতো লোকেরা। যারা এই কাজ আগে থেকে কখনও করেনি, কিন্তু প্রথম দিন থেকেই উদ্ধার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। নয়তলা ভবন দোতলা হয়ে গেছে। মাটির নিচেও একটা তলা আছে। ফাঁকফোঁকর বের করে নিচে ঢুকতে পারলে যেমন লাশ পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া গেছে জীবিত মানুষ। দুই হাজারের বেশি জীবিত মানুষ উদ্ধার করেছে উদ্ধারকারীরা। সেনাবাহিনী, দমকল বাহিনী, পুলিশ-আনসার, সাধারণ মানুষ, সবাই এখানে কাজ করে চলেছে জীবন বাজি রেখে।

দাউদ মিয়া অনেক রাতে বাড়ি ফেরে। তার শরীর চলতে চায় না। তার পরনের কাপড়ের আসল রং বোঝা যাচ্ছে না। সারা দিনে কী খেয়েছে, মনেও নাই। পুরো এলাকাটায় এখন লাশের পচা গন্ধ। সেই গন্ধের মধ্যে বসে কি খাওয়া যায়?

ঘরে ফিরে দেখে তার দুই ছেলেকে নিয়ে ভাগ্নি নাসরিন ঘুমুচ্ছে। শুধু বাচ্চাদের নানি উঠে দরজা খুলে দেয়।

নানি তার পরনের শাড়ি ঠিক করতে করতে বলে, বাবা, হাসনার কোনো খবর পাইচেন?

না আম্মা। পাই নাই। আজকাও ৭ জনক জ্যান্ত উদ্ধার করা গেইছে।

যাও গোসল করেন। গোসল করিয়া আসি ভাত খান। মুই ভাত বাড়ি দেওঁ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাউদের নিজের বউয়ের কথা ভাববার সময় নাই। ভাত খেয়ে সে মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত শরীরে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে তার খেয়ালও নাই।

ঘুম ভেঙে গেলে সে লজ্জা পায়। চারদিকে এত আলো। আর সে কিনা ঘুমুচ্ছে।

শান্ত আর শাহিন উঠেছে অনেক আগেই। তারা ঘরের সামনের রাস্তায় ঘর কেটে বাঘবন্দি খেলছে।

বাইরে বেরিয়ে দাউদ দেখতে পায়। চোখমুখ ধোওয়ার জন্য কলতলায় গিয়ে দেখে, নাসরিন তার কালকের কাপড়চোপড় ধুচ্ছে।

বাচ্চাদের নানি বাসনকোসন মাজছে।

শান্ত বলে, বাবা, আমিও যামু।

কই যাবা?

রানা প্লাজা।

ক্যানে?

মারে বাইর কইরা আনুম।

শাহিন বলে, বাবা, মুইও যাইম।

ক্যানে?

মুই মাক বাইর করি আনিম।

ক্যামন করিয়া?

শান্ত বলে, তোমরা তো বড়। সব জায়গাত ঢুইকা যাইতে পারো না। আমি ছোট। ছোট ফুটা দিয়া ঢুইকা গিয়া মারে বাইর কইরা আনুম।

শাহিন বলে, হ বাপো। মোক ঢুকি দেও। মুই পারমো।

নানি বলে, বাবা। তুমি ঘরত যান। উটি বেলি থুইছো। উটি সেকি দেও। খায়া যান।

দাউদ ঘরে যায়। শাশুড়ি মাথায় লম্বা কাপড় দিয়ে ঘরে ঢুকে ইলেক্ট্রিক চুলায় তাওয়া বসায়।

দাউদ চুপচাপ বসে থাকে। মাথার ওপরে ফ্যান ঘোরে। হঠাৎই তার নজরে আসে সন্ধান চাই পোস্টারটা। হাসনার ছবি দেওয়া পোস্টার। সে পোস্টারটা হাতে তুলে নেয়। এতদিন সে উদ্ধার কাজের ঘোরে নিমগ্ন ছিল। এখন এই মুহূর্তে, যখন রুটি সেঁকার গন্ধ এসে নাকে লাগছে, সামনে থালার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে কিছু তরকারি, তখন দাউদের হাসনার কথা মনে পড়ে। হাসনা কি এখনও জীবিত আছে? নাকি মারা গেছে। ৭২ ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ৭২ ঘণ্টা একটা ছোট্ট জায়গায় আটকা থাকতে কেমন লাগবে। সে একবার তাদের অফিসের লিফটে আধঘণ্টা আটকে ছিল। লিফটে বাতি ছিল না। সেই আধঘণ্টা তার জীবনের সবচেয়ে ভয়াবহ আধঘণ্টা হয়ে আছে। এখন খাওয়া নাই, পানি নাই, অক্সিজেন নাই, আশা নাই, এই অবস্থায় কেউ যদি আটকে থাকে ওই ধ্বংসস্তূপে, তার কেমন লাগে। যদি তার আশে-পাশে লাশ পড়ে থাকে? যদি তার পায়ের ওপরে একটা বিম পড়ে থাকে?

হাসনা আটকে আছে এইভাবে? নাকি মারা গেছে।

শাশুড়ি গরম রুটি দিয়ে যায় দাউদকে। দাউদ রুটি খেতে পারে না।

এই সময় তার মোবাইলে ফোন আসে।

হ্যালো, আপনি দাউদ বলছেন?

জি বলছি।

আপনার স্ত্রী হাসনা বেগম?

জি।

আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে একটা বাথরুমে আটকা পড়ে আছেন।

AMARBOI.COM

কী বলে?

হ্যাঁ।

আমি আসতেছি।

দাউদ এক লাফে উঠে পড়ে। তার পরনে লুঙ্গি। সে লুঙ্গি পরেই দৌড় ধরে।

শাশুড়ি বলে, কী হইছে।

আম্মা, হাসনা বাঁচি আছে। মুই আসতেছোম।

নাসরিন দৌড়ে আসে। শান্ত ও শাহিন দৌড়ে আসে। শাহিনের প্যান্টের জিপার খোলা। নুনু দেখা যায়।

দাউদ কাউকে কিছু না বলে দৌড়াতে থাকে রানা প্লাজার দিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ধারকর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য। নিচতলায় তাহলে আরও কাউকে কাউকে পাওয়া যেতে পারে।

একটা দেয়াল ফুটা করতে পারলেই তাদের বের করে আনা সম্ভব।

সাবের, মিলন, জামান প্রস্তুত। মিস্ত্রি জয়নালের নেতৃত্বে দেয়াল ভাঙা চলছে। গণেশ রড কাটছে। মাটির নিচে জায়গাটা। মাথায় বাঁধা টর্চ দিয়ে আলো ফেলা হয়েছে। ছোট ছোট অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে অক্সিজেনও দেওয়া হচ্ছে ভেতরে। ছাদে একটা ছোট্ট ফুটা করে খাবার পানি, খাবার নামানো হয়েছে। অক্সিজেন দেওয়াও বিপজ্জনক। ওয়েল্ডিং করতে গেলে আবার আগুন লেগে যেতে পারে।

দাউদ কী করবে বুঝতে পারছে না। সে ছটফট করছে। আমাকে ওই ফুটা দিয়েই ঢুকতে দেন। আমি গিয়ে আমার বউয়ের পাশে দাঁড়াই।

না না। পাগলামো কোরো না তুমি কথা বলো।

দাউদ ছাদের ফুটায় মুখ দিয়ে ডাকে, হাসনা।

ভেতর থেকে জবাব আসে, জি।

হাসনা, আমি দাউদ।

শান্ত শাহিন কেমন আছে।

সবাই ভালো আছে। তোমার মা আসছে। সবাই ভালো আছে। তুমি আরেকটু ধৈর্য্য ধরো। আর পনেরো মিনিট।

আধ ঘণ্টা পরে হাসনা বেরিয়ে আসে। সে হেঁটে হেঁটেই বের হয়। তারপর তাকে স্ট্রেচারে তোলা হয়। দাউদ দৌড়ে গিয়ে স্ট্রেচার ধরে। অ্যাম্বুলেন্স রেডিই ছিল দাউদ অ্যাম্বুলেন্সে ওঠে।

হাসনা তার পাশে শোওয়া। সে হাসনার মাথার চুলে বিলি কাটে।

হাসনা হাসে। তার চোখেমুখে ভয়। অ্যাম্বুলেন্স হাসপাতালের দিকে যায়। এনাম হাসপাতাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসপাতালে হাসনাকে পরীক্ষা করে ডাক্তাররা বলেন, ওনার সব কিছু ঠিক আছে।

শুধু ওনাকে একটু স্যালাইন দিয়ে রাখতে হবে।

দাউদ বলে, আমি যাই, আমাদের ছাওয়া দুইটাকে ধরি আসি।

ডাক্তার বলে, না না, আপনি ওনাকে নিয়েই যেতে পারবেন।

দুপুর গড়িয়ে যাবার আগেই অ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ায় গলির মুখে। দাউদ আর হাসনা নামে অ্যাম্বুলেন্স থেকে। শান্ত, শাহিন মাকে জড়িয়ে ধরে। নানি বলে, ওই, মাক ঘরত ঢুকিবার দে। একনা জুড়াবার দে। আল্লাহ, তুমি রহমানুর রহিম। আল্লাহ তুমি হেফাজতকারী। তুমি বাঁচাইলে কে মারিবার পারে।

হাসনা বলে, মা, তোমরা কুনসুম আসিলেন? শরীল ভালা আছে। নাসরিন, ভালা আছিস মা।

বিজলিও শোনে সুখবরটা। মোটা পেটটা নিয়ে সে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ায় এই ঘরের দরজায়।

AMARBOI.COM

****

হতভাগ্যা শাহীনার মরদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক । তারিখ: ২৯-০৪-২০১৩

সাভারের রানা প্লাজার ধ্বংসস্তূপ থেকে আজ সোমবার বেলা সাড়ে তিনটার দিকে হতভাগ্যা শাহীনার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রোববার দিনভর উদ্ধারকর্মীরা শাহীনাকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধারের চেষ্টা করেন। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) জানায়, আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে শাহীনার মরদেহ ধ্বংসস্তূপ থেকে বের করে আনা হয়। তাঁর মরদেহ অধরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয় মাঠে নেওয়া হয়েছে।

গতকাল সকালে ভারী যন্ত্র দিয়ে সাভারের ধ্বংসস্তূপে উদ্ধার অভিযান শুরু করার কথা ছিল। কিন্তু ধসে পড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবনের তৃতীয় তলায় শাহীনাসহ কয়েকজন জীবিত রয়েছেন বলে উদ্ধারকর্মীরা নিশ্চিত হন। এ জন্য ওই অভিযান স্থগিত করা হয়। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আটকা পড়া শাহীনাকে জীবিত উদ্ধারের চেষ্টার সময় তৈরি করা সুড়ঙ্গে রাত ১০টার দিকে আগুন লাগে। এ সময় উদ্ধারকর্মীরা নিরাপদে বের হয়ে এলেও শাহীনাকে উদ্ধার করতে পারেননি। সেখান থেকে রাত দেড়টার দিকেও ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হতে দেখা যায়। ভেতরে আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ফায়ার সার্ভিসের লোকজন ওপর থেকে সেখানে পানি ছিটাচ্ছিলেন। পরে আজ বেলা সাড়ে তিনটার দিকে হতভাগ্য শাহীনার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাকলি বেগম ঘুমিয়ে পড়েছিল।

আবদুস সালামকে গোরস্থ করা হয়েছে। তারপর তার জন্য মিলাদের আয়োজনও করা হয়েছিল। নার্গিস ও নাজনীনও ঘুমুচ্ছে। মেয়ে দুটো জানে না, বাবা হারানো মানে কী। এই যে সাভারে যাওয়া, বাবার লাশ নিয়ে আসা, তাকে কবরস্থ করা, মিলাদ, এইসবের মধ্যে একটা উৎসব উৎসব ভাব আছে। বাচ্চা দুটো এই সব কর্মপ্রবাহে ভেসে ভেসে দিন কাটাচ্ছে।

কিন্তু এখন, এই রাতে, একাকী ঘরে শুয়ে কাকলি বেগম বুঝতে পারে, এই যাওয়া মানে চলে যাওয়াই। এই বিছানায় তারা তিনজন সব সময়ই শুয়ে আসছে, আবদুস সালাম তো ছুটিছাটা না পেলে আসেই না বাড়ি, তবুও এখন কাকলি বেগম বুঝতে পারছে, এই বিছানার শূন্যতা আর কোনোদিনও পূর্ণ হবে না। ব্যাংক থেকে চিঠি এসেছে, এক লাখ টাকা দেবে, ইউএনও অফিস থেকেও লোক এসেছিল, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে খোঁজখবর করতে বলেছে, ঢাকায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে যেতে হবে, প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে টাকা দেবেন। টাকা দিয়ে কাকলি কী করবে? সে তার স্বামীকে চায়। তার স্বামী বছরে একবার দুইবারই আসত। তবুও একবার দুইবারের জন্যই সে স্বামীকে চায়। আর তাছাড়া আবদুস সালাম বলেছিল, তাদেরকে সাভারে নিয়ে যাবে সে। তার প্রমোশন ডিউ হয়ে আছে। প্রমোশনটা হলেই পুরা পরিবারকে নিয়ে যাবে সাভারে। বাসাভাড়া করবে। সেখানে নার্গিস নাজনিন স্কুলে ভর্তি হবে।

রাত কটা বাজে কে জানে।

বাইরে মনে হয় বৃষ্টি পড়ছে। দেয়া ডাকে, বিজলি চমকায়, টিনের ঘরের ফাঁকফোঁকর দিয়ে আলোর ঝলক আসে ঘরে।

এই সময় দরজায় নক।

কাকলি কাকলি।

এ যে আবদুস সালামের গলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুস সালাম এত রাতে কোত্থেকে? সে না মারা গেছে।

কাকলি ধড়ফড় করে উঠে বসে। কে? তার গলা দিয়ে স্বর বেরুতে চায় না।

আমি সালাম।

কাকলির সমস্ত শরীর কাঁপে। উঠে লাইট জ্বালে। মনে হয় কারেন্ট নাই। সে মোমবাতি জ্বালে।

মোমবাতি হাতে নিয়ে দরজা খুললে সামনে দেখতে পায় আবদুস সালামকে।

তুমি?

হ্যাঁ।

কোথায় ছিলা?

সে লম্বা হিস্ট্রি। বলতেছি। ঘরে আসতে দাও।

তুমি বাঁইচা আছো?

দেখতেই পারতেছো।

কাকলি বেগম জড়িয়ে ধরে আবদুস সালামকে। তার হাত থেকে মোমবাতি পড়ে যায়। অন্ধকার ঘরের মেঝেতে তারা দুজন দুজনকে পাগলের মতো চুমু খেতে থাকে।

AMARBOI.COM

'বৃত্তান্ত কী? খুইলা কও তো।'

'আরে আগের দিন আমি গেছলাম ঢাকায়। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যা পারায়া গেল। কিছু পাই না। তখন দেখি, একটা মাইক্রোবাস গাবতলির দিকে যায়। আমারে দেইখা খাড়াইল। বলল, কই যাইবেন। আমি কইলাম, সাভার। কইল, ত্রিশ টাকা লাগব। উঠলে উঠেন। আমি ভাবলাম, আল্লাহ তো মুখ তুইলা চাইল। উইঠা পড়লাম।

গাবতলি পার হওয়া পর্যন্ত মনে আছে। তারপর নাকে কী একটা ধরছে, আর কিছু জানি না।

আজকা বিকালে হুঁশ হইছে। দেখি আমি ঢাকা মেডিকাল কলেজের হাসপাতালের মেঝেতে শোওয়া। পকেটে কিছু নাই। না একটা টাকা। না মানিব্যাগ। না মোবাইল ফোন। তারপর উইঠা সব বৃত্তান্ত কইলাম। একজন আমারে ৫০০ টাকা ধার দিল। আমি সোজা কুমিল্লার বাস ধইরা দাউদকান্দি রওনা হইলাম। আরে যাত্রাবাড়ি সায়েদাবাদ পার হওন যায় না। এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যাম। রাইত হইয়া গেল।

কাকলি বলে, মারে ডাকি। সুবহানরে ডাকি। সবাই তো জানে তুমি মারা গেছ।

মারা গেছি মানে।

তোমার রানা প্লাজা ভাইংগা পড়ছে। হাজার মানুষ মারা গেছে। আমরা ভাবছি তুমিও মারা গেছ। আবদুস সালাম নামে একজনের লাশ পাওয়া গেছে। সেইটা আইনা আমরা দাফন-কাফন করছি।

কও কী?

কারেন্ট আসে।

সেই আলোয় আবদুস সালাম নার্গিস আর নাজনীনকে দেখে। ওরা ঘুমাচ্ছে। ঘুমাক।

আবদুস সালামকে ব্যাংকের চিঠি দেখানো হয়। ইউএনওর চিঠি। ব্যাংকওয়ালারা এক লাখ টাকা দেবে। প্রধানমন্ত্রী দেবেন নগদ টাকা। (কত সেটা চিঠিতে বলা হয় নাই)

আবদুস সোবহানরে ডাকো। মারে আর এত রাইতে ডাইকো না। সকালবেলা বুইজা কাম করতে হইব।

কাকলি বেগম আবদুস সোবহানের ঘরে যায়। আবদুস সোবহান ও আবদুস সোবহান।

জি ভাবি।

একটু বাইরে আসো।

আবদুস সোবহান চোখ ডলতে ডলতে বের হয় ঘর থেকে। লুঙ্গি টেনে ঠিক করে।

আমার ঘরে আসো।

আবদুস সোবহান বুঝতে পারে না ভাবির উদ্দেশ্য। সে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

তোমার ভাইজান মারা যায় নাই। ওই লাশ ভাইজানের না।

কে কইল।

তোমার ভাইজান নিজেই কইতাছে। আহো ঘরে। দেখো, ভাইজান আইছে।

কও কী। আবদুস সোবহানের মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে ভাবির ঘরে যায়। ভাইজানকে দেখে জড়িয়ে ধরে কাঁদে। কান্নাকাটি থামলে তারা বাস্তবতার বিশ্লেষণ করতে থাকে।

এখন যদি তারা বলে, আবদুস সালাম মারা যায় নাই তাহলে টাকা পাওয়া যাবে না। রানা প্লাজা ভেঙে গেছে। গার্মেন্টস বন্ধ। বেতন পাওয়া যাবে না। আবদুস সালাম ওইদিন কাজে যায় নাই। বিধিমতো তার কোনো কিছু পাওনা নাই। পাওনা থাকলেও দেবে কে? তার চেয়ে এই ভালো, আবদুস সালাম মারা গেছে।

আবদুস সালামকে লুকিয়ে থাকতে হবে। অন্তত কয়েক মাস।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বর্ডারে আবদুস সালামদের বোনের বাড়ি। আজ রাতেই সে সেখানে চলে যাবে। টাকাটা পাওয়া গেলে সে বর্ডারে ব্যবসা শুরু করবে।

আবদুস সালাম মেয়ে দুটোকে দেখে নেয় শেষ বারের মতো। ওদের ডেকে তোলার মানে হয় না। ওরা যদি দেখে বাবা বেঁচে আছে, সবাইকে জানিয়ে দেবে।

ওই রাতেই আবদুস সালাম বেরিয়ে পড়ে।

নার্গিস আর নাজনীনের পাশে শুয়ে কাকলি বেগম কাঁদতে শুরু করে। স্বামী-হারানোর কান্না।

মায়ের সঙ্গেও দেখা করে না আবদুস সালাম। মা তাকে দেখলে চিৎকার চেঁচামেচি করবে। লোক জানাজানি হয়ে যাবে।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। একটা গামছায় মুখ ঢেকে আবদুস সালাম চলতে থাকে। কেউ তাকে চিনতে পারবে না আশা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংসস্তূপের নিচে ১০০ ঘণ্টা!

মো. সাইফুল্লাহ । তারিখ: ১১-০৫-২০১৩ ছুটির দিনে প্রথম আলো

মৃত্যুপুরী

রানা প্লাজার তিনতলায় অবস্থিত নিউওয়েভ বটম লিমিটেডের মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপক সাদিক। ২৪ এপ্রিল সকালে কর্মস্থলের দিকে যাওয়ার সময়ই কেন যেন তাঁর মনে হচ্ছিল, একটা খারাপ কিছু ঘটতে যাচ্ছে। গার্মেন্টসের সদর দরজায় গিয়েও দেখেন একই অবস্থা। শ্রমিকেরা এক পা এগোন তো এক পা পেছান। কেউই ভেতরে ঢুকতে চাইছিলেন না। ভবনের পিলারে ফাটল ধরেছে বলে আগের দিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেছে। এদিন দেখা গেল, ফাটল আরও বড় হয়েছে। তাই ভেতরে ঢুকতে এত ভয়। তবু চাকরি যাওয়ার ভয়ে একে একে সবাই ভেতরে ঢুকে পড়লেন, সঙ্গে সাদিকও।

'তখন সম্ভবত পৌনে নয়টা বাজে। পেছনে তাকিয়ে হঠাৎ মনে হইল সব মেশিন, সব মানুষ থেমে গেছে। পুরা বিল্ডিং কেঁপে উঠল। মাথার ওপরে ছাদগুলা মনে হইল একের পর এক ভেঙে পড়তেছে। সবাই গেটের দিকে ছুটল। সারি সারি মেশিনের মাঝখান দিয়ে আমিও ছুটলাম। পেছন থেকে একটা মেয়ে আমার হাত আঁকড়ায় ধরে বলল, "ভাই, আমারে নিয়া যান।" আমি বসে পড়লাম। তারপর দেখি সব অন্ধকার। মোবাইলের আলো জ্বালায়ে দেখলাম, দেড় ফুট উচ্চতার একটা জায়গায় কোনোমতে বসে আছি। মাথার ওপর ছাদটা ফেটে চৌচির হয়ে আছে। টোকা দিলেই মনে হয় ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়বে। কোনো রকম ছাদের রিমগুলার সঙ্গে আটকে আছে। মোবাইলের আলোয় দেখলাম, চারিদিকে আটকা।' বলছিলেন সাদিক।

মৃত্যুপুরীতে শুরু হলো সাদিকের সুদীর্ঘ একেকটা মুহূর্ত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে মুঠোফোনের আলোটুকুই সম্বল। নেটওয়ার্কও নেই যে কাউকে ফোন করে সাহায্যের আবেদন করবেন। সোজা হয়ে বসার উপায় নেই। মেঝেতে ভাঙা কাচ, ভাঙা টাইলস, শুয়েও থাকা যায় না। চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ, গোঙানি। এমন সময় শুনতে পেলেন ড্রিল মেশিনের শব্দ। একটু সাহস হলো। যাক, উদ্ধার হওয়ার আশা আছে। সাদিক তখনো জানেন না, তাঁকে এই মৃত্যুপুরীতে আটকে থাকতে হবে আরও ১০০ ঘণ্টা।

AMARBOI.COM

পানি!

কতক্ষণ কেটে গেছে, সাদিক জানেন না। বাইরে দিন না রাত, তা-ও জানেন না। উদ্ধারকারীদের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে। চিৎকার করতে করতে ক্লান্ত হয়ে? গেছেন, কেউ শুনতে পায়নি। কোথা থেকে যেন ভেসে আসছে রক্তের স্রোত। কাছেই কোথাও একটা বাথরুম ভেঙে আছে। সেখান থেকে ময়লা পানি এসে সারা শরীর মাখামাখি। তীব্র দুর্গন্ধ। এতসবের মাঝেও তখন সাদিকের প্রয়োজন শুধু একটুখানি পানি। শুয়ে শুয়ে একটু এদিক-ওদিক যাওয়া যায়। চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দুটো পানির বোতল পাওয়া গেল। ভেতরে অল্প পানি। সেই পানিটুকু দিয়েই তিনি একটু গলা ভেজালেন। পিলারের ওপাশে আরও দুজন বেঁচে ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আশপাশেই শোনা যাচ্ছিল আরও অনেক মানুষের আহাজারি, চিৎকার।

'একজন পানির অভাবে একসময় নিজের হাত ছেঁইচা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুইষা চুইষা রক্ত খাওয়া শুরু করল। আরেকজনের পা আটকায় গেছে। ইট দিয়া ছেঁইচা ছেঁইচা নিজের পা বাইর করতেছিল। আমি শুধু দোয়া-দরুদ পড়ছি, আর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইছি। একসময় সবাই চুপ হয়া গেল। আমি একাই চিৎকার করতেছিলাম। ইট দিয়ে টিনের গায়ে বাড়ি দিতেছিলাম।' বলছিলেন সাদিক।

ভেতরে মানুষ আছে!

সাদিক তখন ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছেন। বাবা, মা, ভাই, বোন সবার কথা মনে পড়ছে। আর বোধ হয় বেঁচে ফেরা হলো না। এমন সময় শুনতে পেলেন খুব কাছেই উদ্ধারকারীদের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। সাদিক প্রাণপণ টিনের গায়ে ইট দিয়ে বাড়ি দিতে থাকলেন। নিচ থেকে তাঁর কথা ওপরে যাচ্ছিল না, কিন্তু ওপরের কথা তিনি শুনতে পাচ্ছিলেন। একসময় উদ্ধারকারীরা বুঝতে পারলেন, ভেতরে লোক আছে! তবু, উদ্ধারকারীদের সাদিকের কাছাকাছি পৌঁছাতে আরও অনেক সময় লাগল। ভবনধসের পর তত দিনে চার দিন পেরিয়ে গেছে। অবশেষে একসময় সাদিক পিলারের ওপাশ থেকে শুনতে পেলেন, 'আপনারা ভেতরে কয়জন আছেন?' সামান্য একটা কথা কী যে মধুর শোনাল!

তৃতীয় তলায় যাঁরা বেঁচে ছিলেন, সবাই চিৎকার করতে লাগলেন। উদ্ধারকারীরা এক এক করে সবাইকে উদ্ধার করতে শুরু করলেন। শুধু সাদিক আর সেই মেয়েটি এমন বেকায়দাভাবে আটকে পড়েছেন, চারদিকে মোটা স্তম্ভ। সহজে তাঁদের কাছে পৌঁছানোর উপায় নেই।

দুঃসহ সময়গুলোর কথা বলছিলেন সাদিক, 'তারা ড্রিল মেশিন দিয়ে পিলারে গর্ত করা শুরু করল। যেকোনো সময় আগুন লেগে যাওয়ার ভয় ছিল। একসময় মোটামুটি একটা গর্ত হইল। আমাদের পানি দিল। পানি

AMARBOI.COM

খেয়ে অনেকটা শক্তি পাইলাম। মেয়েটাকে ওরা টেনে বের করে নিল। কিন্তু আমারে আর বাইর করতে পারে না। অনেক টানাটানি করছে, বুকের কাছে আটকায় যায়। কাপড় খুলে সারা গায়ে তেল মাখলাম, তবু বের করা যায় না। ভেতরে অক্সিজেন এত কম, উদ্ধারকারীরাই একটু পরপর বেহুঁশ হইয়া যাইতেছিল। আমি যে কীভাবে বাইচা ছিলাম, জানি না। খোদার অশেষ রহমত। একসময় তারা চেষ্টা করতে করতে হাল ছেড়ে? দিল। একজন আমাকে একটা ছেনি আর একটা হাতুড়ি দিয়ে চলে গেল। বলে গেলঃ আমরা তো পারতেছি না। আপনি একটু একটু করে চেষ্টা করতে থাকেন।' সাদিক চেষ্টা করলেন। কিন্তু দুর্বল হাত কিছুতেই চলে না। পিলার ভেঙে বের করার চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

কিন্তু রাজু নামের এক উদ্ধারকর্মী হাল ছাড়লেন না। তিনি ছাদ ভেঙে একটা ফোঁকড় তৈরি করলেন। অবশেষে সাদিকের বের হওয়ার পথ হলো। 'আমি বললাম, আমার গায়ে তো কাপড় নাই, আমারে একটা জামা দেন। তারা আমাকে একটা লাল গেঞ্জি দিল। সেইটা গায়ে দিলাম।' বলছিলেন সাদিক।

AMARBOI.COM

আশা-নিরাশা

বাবা কাজী আহসান পাঁচ দিন ধরে ছোটাছুটি করছেন। একবার অধরচন্দ্র স্কুলে যান, আবার যান রানা প্লাজার কাছে। বাবার মন। ছেলে বেঁচে আছে, এই আশাটা কখনোই হারাননি। হঠাৎ খবর পেলেন, সাদিক নামের একজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। বাবা কাছে যেতে না যেতে ততক্ষণে ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সাদিকের চাচাতো ভাই তুহিন উদ্ধারকর্মীদের সঙ্গেই ছিলেন। তিনি বললেন, 'চাচা, আমি দেখছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু যারে উদ্ধার করা হইছে, তার গায়ে তো লাল গেঞ্জি। সাদিকের পোশাকের সাথে মিলে না।' এর মধ্যে মাইকে ঘোষণা শুরু হলো, সাদিক নামের আরেকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত অবস্থায়। তাঁকে অধরচন্দ্র স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আহসানের যেন দম বন্ধ হয়ে আসছিল। আশা-নিরাশার এই দোটানা তিনি আর নিতে পারছিলেন না। কোথায় যাবেন? হাসপাতাল, নাকি অধরচন্দ্র স্কুল?

এর মধ্যে উদ্ধারকর্মীদের একজনকে ছেলের ছবি দেখালেন। তিনি বললেন, 'চাচা, আপনি এখানে আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করবেন না। হাসপাতালে যান।'

কাজী আহসান হাসপাতালে ছুটলেন। নিবিড় পর্যবেক্ষণ রুমের দরজার এপাশ থেকে দেখলেন, হ্যাঁ, ওই তো সাদিক! তাঁর ছেলে!!

AMARBOI.COM

নতুন জীবন

সাদিক এখন মোটামুটি সুস্থ আছেন। পায়ের তিনটা হাড় ফেটে গেছে, সেখানে ব্যান্ডেজ আছে। ডাক্তার বলেছেন, শিগগিরই সুস্থ হয়ে উঠবেন। সাদিক বললেন, আর কখনো পোশাক কারখানায় চাকরি করবেন না। সুস্থ হলে অন্য কোনো চাকরিতে ঢুকবেন।

পুরো পরিবারের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড ধকল গেছে। মা অসুস্থ শরীর নিয়েও রান্নায় ব্যস্ত। সাদিককে দেখতে চারদিক থেকে স্বজনেরা আসছেন। ছোট ভাই সানাউল্লাহ তাঁদের আপ্যায়নে ব্যস্ত। সাদিকের বাবা বললেন, 'পরিচিত-অপরিচিত সবাই অনেক দোয়া করছে। সবার দোয়া ছিল বলেই আমার ছেলেরে ফিরে পাইছি।'

ছবি তোলার জন্য আমরা পরিবারের সবাইকে একত্রে করলাম। তিনজনের সোফাতেই পাঁচজন গাদাগাদি করে বসলেন। শ্রেয়া ঠিকই বড় ভাইয়ার পাশের জায়গাটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখল করে নিল। সাদিক অবশ্য শ্রেয়াকে কোলে নিয়েই বসতে চাচ্ছিলেন। শ্রেয়া রাজি হলো না। ভাঙা পা নিয়ে ভাইয়া তাকে কোলে নেবে, তাই কি হয়? ভাইয়ার কষ্ট হবে না?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গভীর রাত। নেত্রকোণার বারহাট্টার গ্রামে আবদুস সালামের বৃদ্ধা মায়ের ঘুম ভেঙে যায় স্বপ্ন দেখে। তিনি দেখেন তার ছেলে আবদুস সালাম বাড়ি এসেছে। উঠানের কাঁঠালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে ডাকছে, রিপন রিপন বলে। রিপনের মা নায়লা সেই ডাক শুনতে পাচ্ছে না। সালামের মা ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে নামেন। শাড়ি সামলাতে সামলাতে দরজার খিল খোলেন। বলেন, বাবা সালাম আইছ বাবা।

জোছনা রাত। আঙিনা ভেসে যাচ্ছে চাঁদের আলোয়। কাঁঠালগাছের নিচে ছায়া। সেখানে তিনি ছুটে যান। না, কেউ নাই।

তিনি যান তার পুত্রবধূ নায়লা খাতুনের ঘরে। বলেন, বউ ও বউ, ও রিপনের মা, রিপনের বাপে আইছেনি?

নায়লা খাতুনের ঘুম ভেঙে যায়। ঘটনা কী বুঝতে না পেরে সেও বেরিয়ে আসে শশব্যস্ত হয়ে। রিপনের বাপে আইছে? কই?

সালামের মা বলেন, রিপনের বাপে আহে নাই? আমি কি তাইলে খোয়াব দেখলাম?

নায়লা বুঝতে পারে ঘটনাটা। তার প্রত্যাশা ভঙ্গ হয়। সে বলে, না, মা, সে তো আহে নাই। চলেন, ঘরত চলেন।

সালামের বৃদ্ধা মা জোছনার ভেতর দিয়ে আঙিনা পেরিয়ে যায় নিজের ঘরে।

সালামের বাবা আবদুল জব্বারের ঘুম ভেঙে যায় পদশব্দে। তিনিও উঠে বসেন, সালাম আইছেনি?

মা বলেন, না আহে নাই। খোয়াব দেইখা ঘুম ভাইঙা গেছে গা।

আবদুল জব্বার বলেন, কী খোয়াব দেখলা?

মা বলেন, দেহি সালাম আইছে। বাইরে ছুইটা গেছি। সালামের বাপ, সালাম কি আর আইব না? অর লাশটাও কি পামু না?

ঝিঁঝিঁ ডাকছে। দূরে ঢোলকলমির জঙ্গলে ডাকে শেয়াল। বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

রিপনকে জড়িয়ে ধরে নায়লা। তার ছেলের বাবা কি আর আসবে না? এই জীবনটা সে পার করবে কী করে? তারা তো কোনো লাশ পেল না। কোনো ক্ষতিপূরণও না। কী হবে তার? কী হবে রিপনের?

দূরে একটা শকুনি মানবশিশুর কণ্ঠে কাঁদে।

*****

লাশ শনাক্তে মুঠোফোন ও পরিচয়পত্রই ভরসা

আনোয়ার হোসেন ও অরূপ রায় । প্রথম আলো: তারিখ: ০৫-০৫-২০১৩

শরীরের সঙ্গে থাকা মুঠোফোন আর পরিচয়পত্রই এখন লাশ শনাক্ত করার প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আর কোনোভাবে লাশ চেনার উপায় নেই। রানা প্লাজা ধ্বসের ১১ দিন পেরিয়ে গেছে।

উদ্ধারকর্মীরা জানান, এখন যেসব লাশ উদ্ধার হচ্ছে, তার সব কটিই বিকৃত হয়ে গেছে। ফলে লাশের সঙ্গে মুঠোফোন কিংবা পরিচয়পত্র পাওয়া গেলে তার মাধ্যমে পরিচয় নিশ্চিত করে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে। যেসব লাশের সঙ্গে মুঠোফোন বা পরিচয়পত্র পাওয়া যাচ্ছে না, সেগুলো ডিএনএ পরীক্ষার জন্য রেখে দেওয়া হচ্ছে।

তবে স্বজনেরা পরিধেয় পোশাক ও শরীরের গঠন দেখে লাশ শনাক্তের চেষ্টা করছেন। কিন্তু প্রশাসন বলছে, এই বর্ণনা শুনে লাশ হস্তান্তর করা যুক্তিযুক্ত হবে না। ফলে ডিএনএ পরীক্ষা পর্যন্ত স্বজনদের অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।

পরিচয় নিশ্চিত না হওয়ায় অধরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে গতকাল শনিবার ১৫টি লাশ রাখা ছিল। এ ছাড়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে ছিল নাম-পরিচয়হীন ৪৮টি লাশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গতকালও কয়েকশ' স্বজনকে লাশের জন্য অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। অধরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে একেকটি লাশের গাড়ি এলে এই লোকগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন।

সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, অধরচন্দ্র উচ্চবিদ্যালয়ের আশপাশের পরিবেশ এখন তিন ধরনের মানুষের আর্তকান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে। একদল মানুষ লাশের পরিধেয় পোশাক ও শরীরের গঠন দেখে নিজেদের স্বজন দাবি করে প্রশাসনের লোকজনের পেছনে ছুটছেন। আরেক শ্রেণী উদ্ধার হওয়া লাশের মধ্যে নিজের নিখোঁজ স্বজনের কোনো চিহ্ন মেলাতে না পেরে চোখের পানি মুছছে। এই দুই শ্রেণির চেয়ে কিছুটা হলেও আশ্বস্ত আরেকটি দল আছে, যারা নিজেদের স্বজনকে চিহ্নিত করে লাশের শেষ মর্যাদা রক্ষা করে দাফনের জন্য নিয়ে যেতে পারছে।

লাশের বোঝা ভারী হচ্ছে: ভবনধসের ১১তম দিনে গতকাল ভোর থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় আরও ২০টি লাশ। এ নিয়ে এই পর্যন্ত ৫৪৩টি লাশ উদ্ধার করা হলো। বিভিন্ন হাসপাতালে মারা গেছেন আরও নয়জন। সব মিলিয়ে ভবনধ্বসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫৫৪ জনে। এর মধ্যে হস্তান্তর করা হয়েছে ৪৬০টি লাশ। জীবিত উদ্ধার দুই হাজার ৪৩৭ জন।

গত রোববার রাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের উদ্ধার অভিযান শুরুর পর থেকে গতকাল বিকেল পর্যন্ত ১৩৩টি লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮৬ জন নারী। আর চারটি লাশ এতই বিকৃত হয়ে গেছে যে নারী, না পুরুষ তা শনাক্ত করা যায়নি।

উদ্ধার অভিযানে অংশ নেওয়া সেনাবাহিনী, ফায়ার সার্ভিস ও রেড ক্রিসেন্টের স্বেচ্ছাসেবকেরা জানিয়েছেন,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন দিন ধরে যত লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, এর প্রায় সবগুলোই ধ্বসে পড়া ভবনের পেছনের অংশ থেকে। ওই দিকের সিঁড়ি থেকেই এসব লাশ উদ্ধার করা হয়। গত শুক্রবার রাতে ওই সিঁড়ির মুখে থাকা কলাপসিবল গেট সরানো হয়। সিঁড়ির আরেকটি অংশ এখনো ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে আছে। সেখানে আরও লাশ থাকতে পারে বলে উদ্ধারকর্মীরা ধারণা করছেন।

পরিচয়পত্র ও মুঠোফোন দেখে লাশ হস্তান্তর: ধ্বংসস্তূপ থেকে লাশ উদ্ধারের পরই উদ্ধারকর্মীরা প্রথমে পরনের পোশাক পরীক্ষা করেন। উদ্দেশ্য, মুঠোফোন কিংবা পরিচয়পত্র পাওয়া যায় কি না? এই দুটির একটি পাওয়া গেলে পরিচয় নিশ্চিত হয়ে চিরকুট লিখে লাশ অধরচন্দ্র বিদ্যালয়ের মাঠে পাঠানো হয়।

গতকাল বেলা একটার দিকে একটি লাশ উদ্ধারের পর সঙ্গে একটি মুঠোফোন পাওয়া যায়। সেই ফোন চালু করে একটি নম্বরে ফোন দিলে অপর প্রান্তে ধরেন সেলিনা আক্তার। তাঁর কাছ থেকেই জানা যায়, নিহত ব্যক্তির নাম এসহাক, তাঁর স্বামী। এসহাক ইথার টেক্স কারখানার হেড অব প্রোডাকশন কো-অর্ডিনেটর ছিলেন। পরিবার নিয়ে সাভারের শাহীবাগে থাকতেন। বিকেলে পরিবারের সদস্যরা অধরচন্দ্র বিদ্যালয়ের মাঠ থেকে এসহাকের লাশ নিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করেন।

দুপুর ১২টার দিকেও একটি লাশ উদ্ধারের পর প্যান্টের পকেটে একটি মুঠোফোন পান উদ্ধারকর্মীরা। সেই ফোন চালু করে একটি নম্বরে ফোন দিলে জানানো হয়, এটি তাঁর চাচার নম্বর। নাম শাহীনুর। বাড়ি বগুড়া। পরে অধরচন্দ্র বিদ্যালয়ের মাঠে লাশ পাঠানো হয় এবং স্বজনেরা এসে লাশ গ্রহণ করেন।

এই দুজনের বাইরে গতকাল আর কাউকে লাশ দেওয়া যায়নি।

AMARBOI.COM

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঁদপুরের নূরজাহান বেগম গতকাল ভোরে একটি লাশকে তাঁর মেয়ের বলে শনাক্ত করেন। তিনি বলেন, শরীরে কোনো মাংস নেই। পরনের পোশাক দেখে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন, এটাই তাঁর মেয়ে সেলিনা। কিন্তু জেলা প্রশাসন শুধু পোশাকের ওপর ভিত্তি করে লাশ হস্তান্তর করছে না। তাই প্রশাসন পরিচয় নিশ্চিতকারী ডিএনএ পরীক্ষা ছাড়া লাশ দেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে।

নূরজাহানের পাশেই বসা ছিলেন তাঁর আরেক মেয়ে আকলিমা। দুই বোনই রানা প্লাজার সপ্তম তলায় কাজ করতেন। আকলিমা ভবনধ্বসের দিন বিকেলে উদ্ধার হন। এর পর থেকে আকলিমা কারও সঙ্গে কথা বলছেন না। নূরজাহান জানান, চিকিৎসক ঢাকায় নিয়ে আকলিমাকে চিকিৎসা করাতে বলেছেন। কিন্তু বড় মেয়ের লাশ নেবেন, না ছোট মেয়ের চিকিৎসা করাবেন, এই হতাশায় কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। একপর্যায়ে নূরজাহান বলেন, 'আমার টেকার কোনো দরকার নাই। লাশটা দিলেই চলব।' জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিটি লাশ সমাহিত করার জন্য ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়।

এক পরিবারের তিনজনের খোঁজ নেই: জামালপুর সদরের সাউনিয়া গ্রামের ইব্রাহিম তাঁর পরিবারের তিন সদস্যের খোঁজে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন ১১ দিন ধরে। প্রথম কয়েক দিন ধ্বসে পড়া ভবনের আশপাশেই ছিলেন। জীবিত পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়ে এখন লাশের অপেক্ষায়। রাতও কাটে অধরচন্দ্র বিদ্যালয়ের মাঠে। কাঁদতে কাঁদতে চোখের পানি শুকিয়ে গেছে। কথা বলারও শক্তি কমে এসেছে। ইব্রাহিম বলেন, ছোট ভাই খোকন, বোন হালিমা ও বোনজামাই আনিস কাজ করতেন রানা প্লাজার পঞ্চম তলায়। ভবনধ্বসের পর মা-বাবা মৃত্যুশয্যায়। তিনি কয়েক দিন ধরে লাশের গাড়ি এলেই দৌড়ে যাচ্ছেন। কিন্তু স্বজনদের চিহ্নিত করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারছেন না।

শুক্রবার রাতে ও গতকাল সারা দিন কয়েকশ' লোককে স্বজনদের খোঁজে অধরচন্দ্র বিদ্যালয়ের মাঠে এ-টেবিল ও-টেবিল ঘুরতে দেখা গেছে।

জেলা প্রশাসনের হিসাব অনুযায়ী, নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা ১৮২ জন। এ তালিকায় নাম ওঠানোর পর জীবিত বা মৃত উদ্ধার করা হয়েছে ৩৩ জন। প্রশাসনের এ তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ে তারা ১৭ জনের অসম্পূর্ণ তথ্য পেয়েছে। আর পাঁচজনের কোনো তথ্য নিশ্চিত হতে পারেনি। কারণ, সন্ধানপ্রার্থী যে ফোন নম্বর দিয়ে গেছেন, তাতে ফোন করলে ও-প্রান্ত থেকে কোনো তথ্যই দিতে পারেননি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। ফলে সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকক্ষ থেকে এখন নিখোঁজ ব্যক্তির সংখ্যা ১২৭ জন বলে জানানো হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজলি বেগমের ব্যথা উঠেছে। হিরু মিয়া তাকে নিয়ে ছুটেছে হাসপাতালে। একটা বেবিট্যাক্সিতে তোলা হয়েছে তাকে। দুপুরবেলা। সিএনজি চালিত ত্রিচক্রযানের পেছনে বসেছে হিরুমিয়া। তার বোনের মাথা তার কোলে। বিজলি বেগম বলছে, ও ভাই, আর কত দূর। আমি তো মইরা যাইতাছি। যানজট। বাসের পেছনে বাস। ট্রাকের পেছনে রিকশা। কোনো রকমে বড় রাস্তাটা পেরুলে হয়। তারা যাবে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র হাসপাতালে।

রানা প্লাজার সামনে দিয়ে যায় বেবি ট্যাক্সি। এই জায়গাটা এখন ফাঁকা। উদ্ধার কাজ শেষ। যারা উদ্ধার পাওয়ার তারা পেয়েছে। অনেকেরই কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নাই। যাদের খোঁজ পাওয়া যায় নাই তাদের একজনের নাম নজিবর রহমান।

এই কদিনে কেউ বিজলি বেগমের খোঁজ নিতে আসেনি। কেউ তাদের বাড়িতে একবার উঁকিও মারেনি। তাদের পাশের ঘরে অনেক টেলিভিশনের ক্যামেরা এসেছে। তারা সবাই হাসনাবুর সঙ্গে কথা বলেছে। হাসনাবুর ছবি অনেক কাগজে ছাপা হয়েছে। টেলিভিশনে নাকি হাসনাবুকে বার বার দেখিয়েছে।

কিন্তু কেউ ভুলেও আসেনি বিজলির কাছে। বিজলি তার স্বামীকে খুঁজে পায়নি। হিরু মিয়া দুলাভাইয়ের শার্ট নিয়ে গেছে, জমা দিয়ে এসেছে। হিরু মিয়া বলেছে, ডিএনএ টেস্ট করিবে। যদি দেখে কোনো লাশের সাথে মিলি যায়, তাইলে হামাক লাশ ফিরত দিবে।

হিরু মিয়া হাসপাতালে হাসপাতালে ঘুরেছে। ঢাকা মেডিকাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে গেছে। কোথাও সে তার দুলাভাইয়ের লাশ খুঁজে পায়নি। তার দুলাভাই হয়তো রানাপ্লাজার ধ্বংসস্তূপে চিরদিনের জন্য মিশে গেছে।

সিএনজি চলছে। জ্যামে পড়ে থামছে। স্টার্ট বন্ধ করছে। আবার চালু হচ্ছে। তারা এক সময় পৌঁছে যায় হাসপাতালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিজলি তখন ব্যথায় অস্থির।

বিজলিকে হাসপাতালের লেবার রুমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সরাসরি।

তাকে ডুশ দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার, নার্স, সবাই মহিলা, বলছে, চেষ্টা করুন। মাথা বের হচ্ছে। এই তো আপনি মা হচ্ছেন..

মাথা আটকে গেছে। ডাক্তার কাঁচি ধরলেন। শোনেন, একটু সিজার করতে হবে। সামান্য। করলাম।

বিজলির তখন হ্যাঁ না বলার শক্তি নাই, সামর্থ নাই।

বাচ্চার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। কান্নার আওয়াজ।

একজন সিস্টার বললেন, ছেলে হয়েছে।

ছাওয়া হইছে। হিরুকে কন, আজান দিতে।

হিরু মিয়া চলে এসেছে। বলে, বুবু, মুই মামা হইছোম। তোমার ছাওয়া হইছে। মামা ভাইগনা যেটে, আপদ নাই সেটে।

হিরু আজান দেয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর।

ডাক্তার বলে, সেলাই দিতে হবে। কাঁচিটা সরাও।

বিজলির মন চলে যায় তার গার্মেন্টস কারখানায়। এই কাঁচি, এই সেলাই, এই সুতা নিয়েই তাদের কারবার।

সে বলতে চায়, ডাক্তার আপা, আপনে আমাকে কাটতেছেন, আমাকে সেলাই করতেছেন, আমিও কাটি। আমিও সেলাই দেই। আমার সোয়ামিও দেয়।

আমার সোয়ামি ফিরে নাই।

আমি ছাওয়ার মাও হইলাম। কিন্তু নজিবর তো ছাওয়ার বাপ হইতে পারল না।

ডাক্তার নিপুণ হাতে ছটা স্টিচ দিয়ে দেয়।

বিজলি ভালো আছে।

সাকিবও ভালো আছে।

হিরু মিয়া মোবাইল ফোনে বাচ্চার নানিকে সেই খবর দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~